KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 200[illegible]	Place of Publication : ৫, [illegible] লেন, কোল-৬৭
Collection KLMLGK	Publisher সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
Title অন্তরীপ (ANTAREEP)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 3/3 3/4 17 12	Year of Publication : [illegible] ১৩৯৫ 1988 May 1990 May 1991
	Condition : Brittle Good
Editor সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Rod No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সন্তরীপ

যদি এই হয় যে আজকের বাংলা সাহিত্য আত্মিকভাবে অবসন্ন আর ক্ষয়ে-ভরপুর বিপুল এক প্রতিষ্ঠান মাত্র, তবে নতুন লেখকের আক্রমণ হবে কোন্ পথে? সে কি কেবল আস্ফালন এবং আক্রোশ জানানো? সেটাই কি আক্রমণ? মৃত্যু জীবনের বিরোধী বলেই তার প্রচণ্ডতা জেনে নিতে হয়, অনড়-প্রতিষ্ঠান সজীব কবিতার বিরোধী বলেই তারও ব্যাপকতা এবং জটিলতা জেনে নিতে হয় তরুণ লেখককে, জেনে নিতে হয় যে 'বিস্ফোরণ' শব্দটাই কিছু বিস্ফোরণ ঘটায় না, জেনে নিতে হয় যে সমাজ নামক কুটিল এই অক্টোপাসের পেষণে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেকটা ক্ষীণ। আত্মিকভাবে নয়, কিন্তু সাংগঠনিকভাবে। এই জেনে নেওয়া কি আমাদের অসহায় করে দেবে আরো? না, এই জেনে-নেওয়াতেই আত্মশক্তির প্রথম পদক্ষেপ। এই জেনে-নেওয়ার ফলেই আমি আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়তার দিকে এগোতে পারি এবং ক্রমশ সমবেত করে তুলতে পারি আরো এইরকম ব্যক্তিগত বন্ধুদল, যারা সকলে একাগ্র প্রত্যয়ে দাঁড়াতে পারে রচনার অন্তর্গত যে-কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে। আত্মসংগঠনের মধ্য দিয়ে অল্প অল্প তৈরি হয়ে উঠবে পুঞ্জিত এক বিদ্রোহী দল, যারা ভিন্ন আয়োজনে কোনো আক্রোশ প্রকাশ না করলেও যাদের সমগ্র অস্তিত্বই হয়ে উঠবে আক্রোশের প্রকাশ, প্রতিবাদ ও বিস্ফোরণ

সম্পাদনা : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অন্তরীপ

একাদশ সংকলন মে ১৯৯০

□ সম্পাদকীয় ৩

□ প্রবন্ধ

স্বপক্ষ দর্পণে প্রমোদ বসু ৫

□ কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুনীলকুমার নন্দী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শিবশম্ভু পাল অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় দেবারতি মিত্র ১৫—২০

□ দু-জন কবি দু-রকম কবিতা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দিব্য মুখোপাধ্যায়

সম্পর্কিত আলোচনা অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ২১—৩১

□ গুচ্ছ কবিতা

ব্রত চক্রবর্তী সুবোধ সরকার নির্মল হালদার সুজিত সরকার ৩২—৩৯

□ দীর্ঘ কবিতা

বিপুল চক্রবর্তী ৩৯—৪১

□ কবিতাগুচ্ছ

জহর সেনমজুমদার সংযম পাল রাহুল পুরকায়স্থ শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

সব্যসাচী দেব অমিতাভ গুপ্ত অজয় নাগ অরুণ সাধুখাঁ প্রবীর রায়

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় দিলীপ ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ গরাই নাসের হোসেন

জয়তী রায় সৃজন পাল চন্দ্রাণী দাশ শৈলেন্দ্র হালদার মলয় দে ৪২-৬২

□ প্রবন্ধ

কবিতার ইস্কুল সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩—৭২

□ বইপত্র

কবিতা নিয়ে দু-টুকরো

ঘরেও দিগন্তের প্রতিশ্রুতি ৭৩-৮১

□ প্রচ্ছদ শঙ্খ ঘোষের 'শব্দ আর সত্য' থেকে

এই সময়ের কবিতা

ভাস্কর চক্রবর্তী	আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে ॥ প্রতিভাস
জয় গোস্বামী	এক ॥ প্রতিভাস
শ্যামলকান্তি দাশ	আমাদের কবিজন্ম ।। স্বর্ণাক্ষর
বিপুল চক্রবর্তী	রাত্রিজল ছুঁয়ে জেগে আছি ।। উলুখড়
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়	দেবীপক্ষে লেখা কবিতা ॥
রতনতনু ঘাটী	জরিপনামা ॥ স্বর্ণাক্ষর
ব্রত চক্রবর্তী	একটি বিষের আংটি ॥
জয়দেব বসু	মেঘদূত ॥ প্রতিভাস
অমিতাভ গুপ্ত	খরা ও যমুনা ॥ প্রতিভাস
সোমক দাশ	কেশরে কে রেখেছিল হাত ॥ প্রমা
সুজিত সরকার	আকাশ, আরো আকাশ ॥ প্রতিভাস
মল্লিকা সেনগুপ্ত	আমি সিন্ধুর মেয়ে ।। প্রতিভাস
সংযম পাল	নীল প্রহর ॥ পা
রণজিৎ দাশ	সময়, সবুজ ডাইনি ॥
দিব্য মুখোপাধ্যায়	খামার বাড়ি ॥ প্রমা
বিশ্বনাথ গরাই	এইসব অপমান, সবুজ সন্ত্রাস ॥ প্রমা
সুবোধ সরকার	মরণোত্তর জল ॥ শতাব্দীর মুখ
অজয় নাগ	দূরের জন্মের ভোর ॥ শিলীন্ধ্র
প্রমোদ বসু	একটা গাছ ॥ স্বর্ণাক্ষর
সব্যসাচী দেব	স্তব্ধ স্মৃতি, বহমান স্রোত ॥ অনুষ্টুপ
অনিতা অগ্নিহোত্রী	চন্দনগাছ ॥ প্রমা
নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়	বছর পঁচিশ বিহ্বলতা ॥ বাল্মীকি
নির্মল হালদার	মৃত্যুঞ্জয়

এখন কবিতা মানে নিজের দুঃখ নিয়ে
ক্রমাগত নাড়াচাড়া নয়
যন্ত্রণাকে মা'ঝে-মধ্যে
মাদুর বিছিয়ে রোদে দেওয়া
বিলাসী রোদ্দুর থেকে তুলে আনা সযত্নে ঘরে

এখন কবিতা মানে
অনায়াস শিথিল যোগ্যতা,
অভিমান ভুলে গিয়ে রাগ কিংবা প্রতিশোধ, ঘৃণা
ব্যক্তিগত মঞ্চ গড়ে বান্ধবের ভীড় জড়ো করা
শীলিত ভাষায় কিছু অপবাদ
ঠুনকো আয়োজন
এখন কবিতা মানে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি
প্রসূত পত্রের কাছে শিবিরের অঙ্গীকার মেনে
কবিতার ভবিতব্য নির্দ্ধারণ করা

এখন কবিতা মানে বিস্মরণে ঐতিহ্য অতীত
বন্ধুতার আশ্রয় দাক্ষিণ্যই আজ

এখন কবিতা মানে তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে
রুমাল নাড়িয়ে চলে যাওয়া
কবির তক্‌মা এঁটে কেউ কেউ পরিব্রাজক
দশকের দস্তুর বেড়া টানাটানি
এরই মধ্যে মঞ্চের এক কোণে
কবিতার ছত্র দুই চার
পড়ে থাকে অনাদৃত উচ্ছিষ্টের মত

যাবতীয় রুচিশীল কবিতাপত্রের

জন্য

'অন্তরীপ'-এর

আন্তরিক শুভেচ্ছা

'অন্তরীপ'-এর পরবর্তী সংকলন সেপ্টেম্বরে

স্বপক্ষ-দর্পণে

—প্রমোদ বসু

কবিতা লেখার শুরুতে আমার কবিবন্ধুরা আমাকে চট করে স্বীকার করে নেননি। কবিতাপাঠের আসরে বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা আমার কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করতেন, কবিতার নয়। সম্পাদকগণ প্রায়শই আমার হাতের লেখার গুণগান করতেন, কবিতার নয়। আমার তীব্র আধ্যাত্মিকতা এবং বিশুদ্ধবাদ সেইসময়ের লেখালিখিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকতো। আমি প্রথম দিকে শব্দ বা চিত্রকল্প নিয়েও তেমন মাথা ঘামাতাম না। এজন্যেও আমাকে বহু বিরূপ সমালোচনা পেতে হয়েছিল। আমি কোনোদিন কফি-হাউসি আড্ডায় নিজেকে জড়াইনি, কোনো সম্পাদকের বাড়িতেও ছুটির দিনে বা রবিবারের সকাল-আড্ডায় তদ্বির-তদারকির জন্যে হাজিরা দিয়ে লেখালিখির সময় নষ্ট করিনি। পাশাপাশি বন্ধুরা, আমি লক্ষ্য করেছি, খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে চলতেন আমাকে। কাগজে-পত্রে আমার কবিতা বিষয়ে সমালোচকগণ লিখতেন দু'চারটি বাক্য, যার সিংহভাগ জুড়ে থাকতো আমার আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও কৌতুক। আঠারো-উনিশ বছর বয়সে আমি 'ঐশ্বরিক অনুভূতিমালা' লিখি। সেই সিরিজের লেখাগুলি বহু লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে এবং শতভিষা, একক, দেশ, অমৃত প্রভৃতি সিরিয়াস পত্রিকাতেও বেরোতে থাকে। আমার তীব্র ঈশ্বরপ্রেম নিয়ে বন্ধুরা আড়ালে-আবডালে হাসাহাসি করতেন। তাঁদের একজন তো ঐ সিরিজটিকে 'হাস্যকর গীতাঞ্জলি' বলতেও কসুর করেননি।

সেই পর্বে আমি অল্প কয়েকজনের উৎসাহ ও স্নেহ পেয়েছিলুম। আজ এতদিন বাদেও আমি তাঁদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। অরুণকুমার সরকার, আলোক সরকার, কৃষ্ণ ধর, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, দেবকুমার বসু, সম্রাট সেন, সুব্রত রুদ্র, সুরজিৎ ঘোষ, অভিরূপ সরকার এবং শ্যামলকান্তি দাশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁরা প্রত্যেকেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমার সেই দুঃসহ দিনে এঁদের দিকে তাকিয়েই আমি সাদা পৃষ্ঠা আর কলম সরিয়ে রাখিনি। বিরূপ সমালোচনা, কবিবন্ধুর ঠাট্টা-তামাসা, সবই এঁদের প্রবল পক্ষপাতিত্ব আর প্রশ্রয়, স্নেহ ও শিক্ষায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। কোনদিনই এঁরা আমায় দূরে সরিয়ে দেননি।

কিন্তু এখনও আমি কৃতজ্ঞ হয়ে আছি সেইসব সমালোচকদের প্রতি, সেইসব কবি-বন্ধুদের প্রতিও, যাঁরা সহজে আমাকে গ্রহণ করে নিতে পারেননি তখন। কেননা,

তাঁদেরই জন্যে আমি প্রতিদিন গভীর প্রত্যয় নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছি। একটি কবিতা বারবার সংশোধন করেছি, নিজস্ব বহু শব্দ তৈরী করে নিয়েছি, এমনকি একেবারে স্বতন্ত্র একটি ভাষা ও আঙ্গিকও গ্রহণ করতে পেরেছি উত্তরকালে; যা আমার 'একটা গাছ' বইটিতে পাঠক লক্ষ্য করবেন।

কবিতা লেখালিখির প্রথম দিকে আমার জীবনযাপনও ছিল দুঃখ আর কষ্টের। তীব্র অনটন, মাটি আঁকড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা, নিরন্ন, নিস্তেজ দিনগুলি আমাকে শাস্তি দিয়েছে প্রচুর। তবু তারাই আমার গভীর একাকিত্বে নিজেকে তন্নতন্ন করে খোঁজার সুযোগ এনে দিয়েছে, তারাই আমার জীবনপ্রবাহকে পূর্ণ সুন্দরের দিকে আধ্যাত্মিক করার রসদ জুগিয়েছে। আজ অবধি আমি কখনোই কবিতায় বানানো কথা লিখিনি। আমার সব কবিতাই আমার নিজস্ব অনুভূতির নির্জন বিস্তার, তা মানুষের ভালো লাগুক আর না-লাগুক।

কবিতা লেখালিখির পিছনে আমার কোনদিনই তেমন কোনো উচ্চাশা ছিল না। এখনও নেই। আমার কবিতা আসলে নিজের সঙ্গে একান্তে কথা বলাই। আমি কখনই সমসাময়িক হৈ-হুল্লোড়ে যোগ দিইনি, চটকদারি কথাবার্তায় চিৎকার করে উঠিনি, এমনকি হাততালি বা পুরস্কার, অগ্রজ কবির অনুগ্রহ বা নজরও আশা করিনি। এখনও করি না। এখনও যে-কোনদিন আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে পারি, যদি বুঝি আমি আর লিখতে পারছি না। কবিতা নিয়ে ধোঁট পাকাতে এখনও আমার তীব্র অনীহা। দলে আমি বিশ্বাস করি না, কবিতা প্রকাশের ব্যাপারে কোনো সম্পাদকের তোষামোদ করা, এখনও আমার পছন্দের বাইরে। আমার একমাত্র আকাঙ্খা ভালো লিখতে পারা আর মানুষ হিসেবে ভালো হওয়া। অমরতা বা জনপ্রিয়তা বিষয়ে আমার সন্দেহ বিস্তর। আমি একটি মাত্র পাঠক চাই, যিনি, তাঁর শোক ও দুঃখ, হাসি ও আনন্দের দিনে আমার কবিতাকে নিজের করে বুকে তুলে নেবেন। আমি একটি মাত্র সমালোচকই চাই, যিনি আপন মেধা ও মননে আমার লেখালিখির ভুলগুলি ধরিয়ে দেবেন, আমাকে সংশোধন করে যথার্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করবেন। আমি একটি মাত্রই পুরস্কার চাই, যার নাম চিরকালীন ভালোবাসা; যা আমার শেষদিন অবধি আমাকে জড়িয়ে থাকবে।

২

লেখালিখির প্রথম বছরগুলিতেই আমি বুঝতে পারছিলুম আসলে ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার নিজেরই। আমি কেন অন্যের মতন লিখবো? আমি কেন সময়ের সঙ্গে পাশা-

পাশি হাঁটবো না? আমি কেন আমার মৌলিকতা আবিষ্কারে মন দেব না?

সৌভাগ্য এই যে, হতাশা আমাকে পেয়ে বসেনি। আমি অবিরাম চেষ্টায় নিজেকে প্রতিদিন পাল্টাতে চেয়েছি। অগ্রজ আর অনুজদের লেখালিখি পড়েছি প্রচুর। অভিরূপ আমাকে বহু বিদেশী কবিতার বই পড়িয়েছিলেন। সুব্রতদা আমাকে বার বার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। সম্রাট সেন হাতে তুলে দিয়েছেন প্রচুর পুরানো পত্রিকা আর কবিতার বই। কলেজি পড়াশুনার পাশাপাশি আমি তখন মনোযোগী ছাত্রের মতন তন্নতন্ন করে খুঁজতে চেষ্টা করেছি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণময় সত্তাটিকে। আর ঠিক তখনই যেন আশ্রয় পেয়ে গেছি অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর আলোক সরকারে। ক্রমশ আমাকে আচ্ছন্ন করেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, ভাস্কর চক্রবর্তী, দেবারতি মিত্র, নিশীথ-ভড়, সুব্রত রুদ্র, শ্যামলকান্তি দাশ, বীতশোক ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমিতাভ গুপ্ত, রণজিৎ দাস, কমল চক্রবর্তী, আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে আমার সেই পর্বে এলিয়ট, ক্রস্ট, এজরা পাউণ্ড, রিলকে এবং কোয়াসিমোদো আমার দিন ও রাত্রি জুড়ে থেকেছেন পরম নির্ভাবনায়। আমি তখন ধীরে ধীরে বুঝতে শিখছি কলমের যথার্থ ব্যবহার: আমি তখন গভীর অভিনিবেশে চিনতে পারছি আমার কাব্যলোক। সেই নির্জন অভাবের দিনগুলিতে এঁরাই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিলেন। আর আমার পরিপার্শ্ব জুড়ে আবাল্য যিনি আছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ আমার উৎসের আকাশ।

এইভাবেই চলছিল সেই দিনগুলি। একদিন সাদা পাতার দিকে মুখ নামিয়েই বুঝতে পারলুম আমার ভাষা পাল্টে গেছে। আমি নির্দ্বিধায় ভেঙ্গে ফেলছি পংক্তি আর চিত্রকল্প। শব্দের জোটবন্ধন আমি নতুন করে ভেঙ্গে গড়ছি ব্যাকরণকে বদলে দিয়েও। আর আমার কথাবার্তা নামিয়ে আনছি নিচু স্বরে, অনেকটা পাশে বসেথাকা মানুষটির সঙ্গে কথা বলবার মতন। অনেকদিন বাদে একটি চিঠিতে কৃষ্ণ ধর একবার লিখেছিলেন, ...'তোমার কবিতার সংবেদনশীলতা অনুচ্চ কণ্ঠে যা বলে, সাজানো ভাষায় তা কখনো সম্ভব নয়।...'

ক্রমশ দূর দূর থেকে ছোটো ছোটো চিঠি আসতে শুরু করলো আমার ডাকবাক্সে। লেখা পাঠাবার অনুরোধ। কাছের বন্ধুরাও দেখলুম আমার প্রতি হঠাৎ মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। বড় বড় কবি সম্মেলনেও ডাক পেতে শুরু করলুম। হয়তো ততদিনে বন্ধুজন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন আমার কাব্যভাষায়। বিরূপ সমালোচনার পাতাগুলি তখন পাখির

পালকের মতন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে গেল নিরুদ্দেশে। কিন্তু সেগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমি তখন হাত জোড় করে আছি।

সত্যি কথা বলতে কি, কটুর সমালোচনাই আমাকে প্রকৃত রাস্তা দেখিয়েছে। পথের পাথর ঠেলে এগিয়ে যাবার শক্তি দিয়েছে। আমার নিন্দুক বন্ধুরাই আমার সবচেয়ে বেশি উপকার করে গেছেন অজান্তে। উন্নাসিক সম্পাদকই আমাকে তেজী করেছেন, বিমুখ ভাগ্যই আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সাহস জুগিয়েছে।

আমার প্রথম বই 'সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা' বেরিয়েছিল একমাত্র সুব্রত রুদ্র-র সহযোগিতায় আর উৎসাহে। যদিও কবিবন্ধু সুকুমার দাসের সঙ্গে তার আগেই বেরিয়েছে 'শব্দের ভিক্ষুক' নামে চটি একটি কাব্য সংকলন, তবু 'সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা'-ই আমার একক প্রথম বই। বইটি নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। তর্ক-বিতর্কও প্রচুর হয়েছে। কিন্তু আমি প্রথম আমার জায়গা পেয়েছি 'একটা গাছ' বেরবার পরেই। কবিবন্ধু সুজিত সরকার এই বইটির প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন 'অধুনা' পত্রে। ছন্দজ্ঞ দীপঙ্কর দাশগুপ্ত এ বইয়ের ভাঙা-পয়ার এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। শ্রদ্ধেয় কবি আলোক সরকার বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন একেবারে এক কথায়। পরের বই 'আত্মপ্রতিকৃতি' বেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে এবং 'সংবাদ' প্রকাশনীর কর্ণধার সুলেখক, সুবন্ধু শ্রীরাধানাথ মণ্ডলের আগ্রহ আর চেষ্টায়। এ বইয়ের পেছনে তিনজনের প্রেরণা এবং তাগাদা ভোলবার নয়। কালীকৃষ্ণ গুহ, সুজিত সরকার এবং ব্রত চক্রবর্তী, আমার সেই তিন প্রিয়জন। পরবর্তীকালে 'দেশ' পত্রিকায় কবি মলয় গোস্বামী লেখেন, '...'আত্মপ্রতিকৃতি'-র অধিকাংশ কবিতা প্রায়-মিতকথনে রচিত। এবং প্রমোদ এই ধরনের কবিতায় বেশী সাবলীল। বর্তমানে কবিতা দুর্বোধ্য হচ্ছে বলে যে রব উঠেছে, সেই রবকে আঘাত করবে এই কবিতাগুলি। প্রমোদের দেখবার এবং বলবার ভঙ্গীতে প্রায়ই লক্ষ করা যায়, বৈরাগ্য মাখানো থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে কবিতাগুলি হয়ে ওঠে বিষম বেদনা-বিধুর। ...' এই প্রসঙ্গে কবি ও সম্পাদক শ্রীগৌতম ঘোষ দস্তিদার জানিয়েছেন, '...প্রমোদের কবিতায় সবচেয়ে ষড় বৈশিষ্ট্য আভরণহীনতা। কোন ভান-ভনিতা, গিমিক-টিমিকে আস্থা নেই তাঁর। খুব সহজ কথা সহজভাবে বলার কঠিন প্রতিভা তাঁর এত অধিক করায়ত্ত যে বিস্মিত না-হয়ে উপায় থাকে না কোন ... ।'

আজ এসব উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি এই হেতু যে, আজ সময় এসেছে আমার বিষয়ে, আমার কবিতায় বিষয়ে, আলোচনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিজস্ব কাব্যভাবনার

কথা জানানোর। আমি কখনোই কোনোভাবে আত্মতৃপ্তিতে আটকে থাকার অবস্থার শিকার হতে চাই না। কিন্তু নিজের কাব্যভাবনা অনুল্লেখে নিজেকে প্রগাঢ় রহস্যময়ও করে রাখতে চাই না। আমি চাই কবি ও পাঠকের মধ্যে সাবলীল হোক বোঝাবুঝির সম্পর্কগুলি। পাঠক যেন বুঝতে পারেন, কবির মনোভূমি আর মেধা, তাঁর নির্মাণ আর অভিজ্ঞতা। এই কারণেই কবিতা লেখকের প্রধানতম কর্তব্য আপন ভাবনা-চিন্তা, কবিতা বিষয়ক ধ্যান-ধারণা এবং সর্বোপরি আপন চোখ ও মনটিকে পাঠকের কাছে প্রকাশ করা, প্রবন্ধ বা গদ্যভাবনায়।

আমার কবিকৃতি বিষয়ে এ যাবৎ বহুজন বহু কথা বলেছেন। আমি সে লেখাগুলির সব বিষয়ের সঙ্গেই যে একমত, তা নয়। আমার অমতের কথাগুলি বিষয়ে আমার কোন অভিযোগও নেই। আমি কেবল আগ্রহী পাঠককে, যোগ্য সমালোচককে আমার সর্বস্বের দিকে মুখ ফেরাবার কথা বলি। তাঁরা যে আমার সব কথাই স্বীকার করে নেবেন এমন আকাশকুসুম ভাবনাও আমি ভাবি না। তবু সমালোচনার উত্তর দেবার অধিকার সমালোচিতমাত্রেরই আছে—এই ধারণাতেই 'স্বপক্ষ-দর্পণে'র সামনে এসে দাঁড়ালুম আজ। এ-লেখায় শেষাবধি আমার কথাই বলতে হবে – এজন্যে লজ্জা ও সংকোচও আমার কম নয়। তবু আসামীর জবানবন্দী তো আদালতের স্বীকৃত সত্য!

৩

আজ অবধি লক্ষ্য করেছি, আমার কবিতা বিষয়ে যে-কোন আলোচনায় লেখা হয়েছে কম-বেশি পাঁচটি বিষয়। (১) আমার কবিতা অনুচ্চ কণ্ঠে রচিত; (২) আমার কবিতায় সন্ন্যাস আর সংসার-এর পাশাপাশি অবস্থান; (৩) আমার কবিতায় তীব্র মৃত্যুবোধ; (৪) আমার কবিতায় আধ্যাত্মিকতা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে এবং (৫) আমার ছোট ছোট কবিতাগুলি আসলে একটি দীর্ঘ কবিতারই অংশমাত্র!

এর প্রতিটি বিষয়ে আমি এখানে সবিনয়ে কিছু লিখছি, যা কারোর মনোমত না হলেও আমার নিজস্ব পাঠকের ক্ষেত্রে বোঝাবুঝির পথ প্রশস্ত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমার প্রায় সব কবিতাতেই আমি অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে চাই। সে কেবল এই জন্যেই যে, আমি কোনদিনই চাইনি কবিতা বারমহলের চেঁচামেচিতে মিশে যাক। অন্দর-মহলের নির্জন একাকিত্বই কবিতার প্রাণভোমরা। একজন পাঠকের মনের ধন, একজন

পাঠকের তা 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'। বিশাল, বিস্তৃত সৌন্দর্য যেমন প্রকৃতই শান্ত, তার চমৎকারিত্ব যেমন আত্মমগ্ন, গভীর, তেমনই যথার্থ কবিতা ধ্যানমগ্ন ঋষির মতোই। বাহ্যিক কোলাহলের বাইরে এসে অনুভবের নীরব সোরগোলেই আপন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সে। বেঁচে থাকবার কবিতা আমাদের প্রাণের মতই, আড়ালে গোপনে থাকে, বাইরে এসে জানান দেয় না 'আছি' 'আছি' বলে। তার শক্তিতেই আমাদের এই বেঁচে থাকা, তবু সে কত নিলিপ্ত, অচঞ্চল এবং অনুচ্চও বটে!

আমি নিজে বিশ্বাস করি, আমাদের জীবনচর্চা আসলে এক নিলিপ্তিরই বিস্তার। অন্তত তারই চেষ্টা। এ দেহ-ধারণের সবচেয়ে বড় শাস্তি আসলে মায়া,—প্রিয় সম্পর্কে লেগে থাকবার মায়া। প্রিয় জিনিসের প্রতি আটকে থাকার মায়া। এই হেতুই শোক-দুঃখ, তাপ-পরিতাপ, আনন্দ-উন্মাদনা। এই জন্যেই আমোঘ মৃত্যুর কারণে দুনিবার ভেঙে-পড়া। তাই, জীবনের আনন্দের সাধনা আসলে এক গভীর নিলিপ্তিরই আরাধনা। আমার কবিতায় আমি বার বার তাই চেয়েছি বৈরাগ্যের কথা বলতে, সন্ন্যাসের কথা বলতে। ঘুরে ফিরে এ দুটিই এসেছে কখনও প্রতীকে, কখনও চিত্রকল্পে। কিন্তু আমিও তো মানুষ, খুব সামান্য সাধারণ এক মানুষ। আমারও তো আনন্দ এই মায়ায়; ভালোবাসা আর প্রেম এই মায়াতেই। আমি কেবল চেষ্টা করেছি মায়াকে পেরিয়ে নিলিপ্তময় জীবনচর্চায়। তাই সংসারের রূপকল্পেও আমার কবিতা মিশে আছে। যাঁরা দেখেছেন আমার কবিতায় সংসার ও সন্ন্যাসের সহাবস্থান, আমি তাঁদের এই মুহূর্তে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক এই প্রসঙ্গে।

১) 'দাঁড়াই, নিলিপ্ত একা, অন্ধকারে; মোহ জানে,
যুবতীও মানে,
রিপুর তাড়না শুধু নৈঋতে-ঈশানে।

আমার আঙুলগুলি ছুঁয়ে যায় বন্ধুতা কেবল;
উন্মাদ, চঞ্চল—
আজ বুঝি, বেঁচে থাকা মায়ার কৌশল!'

২) 'মাঝে মাঝে নিজের হাওয়ায় ভাসি, অন্যমন।
ভাঙা চৌকাঠের কাছে মুখ নিয়ে বলি, 'ক্ষমা কোরো,
বহুদিন দাঁড়িয়ে গিয়েছি ভুল করে।

আমি তো তপস্বী নই, আমি খুব সাধারণ লোক,
আমি ঠিক প্রণাম জানি না।.....'

এইভাবেই বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে আমার কবিতাগুলিতে মানুষ, সংসার, মায়া, প্রেম, বিরহ আর সন্ন্যাস মিলেমিশে গেছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনেও তো এদেরই একসঙ্গে থাকা। কেউ লেগে আছে গায়ে-গায়ে, কেউ একান্তে, একপাশে। কোনো কোনো মুহূর্ত যেন বৈরাগ্যের তিলক-আঁটা সাংসারিক আনন্দ! আমি কবিতাতেও চেয়েছি এই সহাবস্থানের কথা বলতে। যা আছে তা মায়া, যা পেরিয়ে গেলে জীবনের নীরব আনন্দ পাওয়া। এই আমার কাব্যভাবনার প্রধানতম দর্শন। এক কথায়, দেহ পেরিয়ে অমূর্ত দেহধারণ। দেহকেও বাদ দিতে পারি না, দেহহীনতাকেও নয়। দুয়েরই সঙ্গে আমার সকল ভাবনার নিত্যদিনের ওঠা-বসা।

আমার কবিতায় তীব্র মৃত্যুবোধ আছে—সমালোচকগণের এই মন্তব্যটিকে আমি স্বীকার করি। তবে এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। আবাল্য একাকিত্বই ছিল আমার সহচর। খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি সংসারের কানাগলির চেহারা দেখে আসছি। আমাদের চরম দুঃখের দিনগুলিতে দুর্ভাবনা আর নিয়তি দু'বেলা এসে দেখে যেত, আমরা কেমন আছি। বেঁচে থাকার সেই আমরণ কষ্টের ভিতরেই আমি মৃত্যুকে প্রথম উপলব্ধি করি। অর্থাৎ অনিশ্চিত জীবন-যাপনের কারণে, শোক-দুঃখ-তাপ ও সন্তাপের জন্যে এবং সর্বোপরি অবিরাম দীর্ঘ একাকিত্বের কারণেই প্রথম দিকে মৃত্যুর নির্জন নিশ্চিন্তি বিষয়ে আমার ধারণা জন্মে। এই হেতুই আমার মধ্যে অসহায়তার অনুভূতি আসে। ক্রমশ বুঝতে পারি ছোট জীবনের দুর্বল দুঃখগুলি আসলে বড় জীবনের আস্বাদ পাবারই উপকরণ মাত্র। এই বোধই আমাকে ফিরিয়ে দেয় আস্তিকতার দিকে। আস্তে আস্তে মৃত্যু-বোধের কেন্দ্রভাবনাও আমার ভিতরে পাল্টে যায়। একদিন যা এসেছিল দুশ্চিন্তার পথ দিয়ে, একদা তা-ই এলো আমার নবলব্ধ অনুভবের পাকা সড়ক দিয়ে। আমি নতুন-ভাবে বুঝতে শিখলুম যথার্থ মৃত্যুবোধই পারে বুক আঁকড়ে জীবনকে ভালোবাসতে। জীবনের প্রতি যাঁর আসক্তি যত বেশি, তিনি ততই মৃত্যুবোধে আক্রান্ত হন। আমার যেসব লেখালিখিতে মৃত্যুচিন্তা বর্তমান, কেউ কেউ সেইসব লেখাগুলি নৈরাশ্য-আক্রান্ত বলে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্য নয়। জীবনকে ভালোবাসতে গিয়ে প্রথমেই তো মনে হয় এ-জীবন ছেড়ে চলে যাবার কথা। আসে মৃত্যুর অনুষঙ্গ। আমি ব্যক্তি-গতভাবে পরজন্মে বিশ্বাস করি না। আমি জানি এই মায়ায়, এই ধুলোয় মানুষের এই একটিবার মাত্র আসা। এই বেঁচে থাকার প্রতি অন্ধ আনুগত্য আর মায়াই আমাকে

বারবার মৃত্যুবোধে যেমন আক্রান্ত করেছে, তেমনই জীবনের ওপারে দেহহীন বড়ো অস্তিত্বের অনুভূতিময় আনন্দসুখে আপন অনুভবের বিস্তৃতির রূপকল্পনায় নির্লিপ্তময় বৈরাগ্যও আমাকে মৃত্যুরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করেছে। দুটি অবস্থা থেকেই আমার কবিতায় মৃত্যুবোধের আনাগোনা। সংসার আর সন্ন্যাসের সহাবস্থান। কোনো নৈরাশ্য বা হতাশা সেখানে নেই, আছে কেবল যা সত্য তা আকুতিময় অক্ষরে ধরে রাখার চেষ্টা। একটি কবিতার কথা বলা যাক,—

'দাঁড়িয়ে রয়েছি একা গাঢ়তম ছায়ার সন্ন্যাসে।

প্রেম নয়, খেলা নয়, এ-বোধের প্রাচীন শেকড়ে
ধুলোর বৈরাগ্যে আছি অন্যমন খেলার স্বভাবে।

ও অগ্নিময় অন্ধকার, ডাক দাও।
শরীর—সর্বস্বে দেখো, এতকাল বেঁচে আছি কিনা।
ও আমার কালোকাঠ, দাহমন্ত্র, ডাক দাও।
প্রাণের সমগ্রে দেখো, অকাতর পাপ ছিলো কিনা!

জলো প্রাণ, জলো দেহ, জলো অকাল মায়ার কৌতুক—
জলো খাঁ-খাঁ আমার মধ্যাহ্নে।

যাই কাঠে, যাই জলে, যাই শব্দ-উচ্চারণে;
যাই মৃত্যু গান্ধর্ব-নিয়মে।'

এর পরের বিষয়টি হলো আধ্যাত্মিকতা। এ-প্রসঙ্গে আমি কিছু আভাস দিয়েছি এ লেখাটির সূচনাপর্বে। এখন একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

আমার ঈশ্বরবোধ একেবারেই রূপহীন, সাবলীল বিশ্বাস। আমার আধ্যাত্মিকতা অলৌকিক ভাবকল্পনায় পর্যবসিত নয়। আমার ঐশ্বরিক চিন্তাগুলি আসলে এক পরিপূর্ণতার প্রতি বিশুদ্ধ আকাঙ্খা। যা সত্য, যা সুন্দর, সম্পূর্ণ—আমার কাছে তা-ই ঈশ্বর। এবং যে বিশ্বাসবোধ এই সম্পূর্ণতার দিকে, এই বিশুদ্ধতার দিকে পরিক্রমণশীল, নিত্য প্রবহমান, আমার কাছে তাই আধ্যাত্মিকতা। দ্বন্দ্বময় জীবনে মানুষের এই সংগ্রামমুখর বেঁচে থাকাও তাই আমার আধ্যাত্মিকতা, আবার ফুটন্ত ফুল, উড়ন্ত পাখি, শান্ত, নির্জন শ্মশানও আমার কাছে ঈশ্বর প্রতিম। কেননা এই সবই সত্য, এই সবই আসলে এক

পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসরমাণ প্রবহমানতা। 'একটা গাছ' বইতে আমি এই বোধের কথাই গাছের রূপকল্পে বলতে চেয়েছিলুম। 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় এক সমালোচক এই রূপকল্পটি ধরতে পারেননি অনধধানতায়। তাঁর ভাবনায় এই 'গাছ' কেবলই 'প্রাকৃতিক' বোধ হয়েছিল। কবিতা অবশ্যই বোধের বিষয়, তা লঘুপাঠ্য উপন্যাসের মতন কেবলমাত্র পাঠেই অনুভব করা যায় না। তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হয়; তবে তার জানলা-দরজা উন্মুক্ত হয়। কবিতা-সমালোচনার নামে প্রায়শই কেউ কেউ পুলিশী কয়েন, ইদানীং এই যা দুর্ভাগ্য কবিকুলের।

আমাদের সমসাময়িক কবিবন্ধু সুজিত সরকারই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, আমার যে—কোন ছোট কবিতাই আসলে একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। ধীমান বন্ধুর এই আবিষ্কার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি এতখানিই পাঠক যে, আমি তাঁর আলোচনাকে সর্বদাই গুরুত্ব দিই বেশি।

আমি নিজেও বিশ্বাস করি, যে-কোন কবিরই সব কবিতা আসলে একটিমাত্র কবিতারই অংশ-বিশেষ। সারাজীবন ধরে তিনি প্রকৃতই একটিমাত্র কবিতাই লিখতে চান। একটি নির্মাণের পরে না-বলা কথার ঘন যামিনীর রহস্য ভেদে আসক্ত হয়ে দুর্বার আর একটি নির্মাণের দিকে এগিয়ে যান তিনি। নিশ্ছিদ্র, অনুপম অনিঃশেষ এক ধারাবাহিকতাই তাঁর কবিকৃতির সমগ্রতা ভরে থাকে। তারই চলমান স্রোতের উত্থান পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, অনুরণিত হতে থাকে প্রতিটি কবিতার অনুভূতিগ্রাহ্য নির্মাণে। এসবই আমার অনুভূতিলব্ধ বিশ্বাস।

আমার নিজের লেখালিখি বিষয়ে এই ধারাবাহিকতা আছে কিনা আমি জানি না। আমার সব কবিতাই যে আসলে দীর্ঘ এক নির্মাণের অংশ, তাও আমি তেমন জানি না। তবে প্রকৃতই যদি তা থেকে থাকে, তাহলে আনন্দ পাবো এই জেনে যে, কবিতায় আমি হয়তো অসৎ হয়ে যাইনি কখনো।

নিজেকে জানতে চেয়েই আমি কবিতা লেখালিখির শুরু করেছিলুম একদিন। নিজেরই অনুভবের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে মানুষ ও সংসার, জীবন ও প্রেম দেখতে চেয়েছিলুম একদিন। কিন্তু কখনই আমি ভেবে দেখিনি একদিন নিজের লেখালিখি বিষয়েই আমাকে এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে হবে পাঠকের আদালতে। এ লেখাটির পিছনে কয়েকজনের অবিরাম অনুরোধ আমাকে দাঁড়িয়েছে। লিখতে বসে ভেবেছি যা চরম

সত্য, যা ভনিতাহীন উপলব্ধি ও বিশ্বাস, তা লিখে রাখা ভালোই। অন্তত একজন পাঠকেরও তাতে সুবিধে হবে বিস্তর। কিন্তু এ লেখা কোনভাবেই আপন অবস্থাটিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নয়। নিজের ঔদ্ধত্যও আমি মুখ বুজে মানি বলে জানি। তবু যা অনুসরণ করি প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, যা বিশ্বাস করি কায়মনবাক্যে তা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করে ফেলার মধ্যে আমি কোন অহঙ্কার দেখি না! নকল বিনয়েও আমার আস্থা নেই। এখনও প্রতিটি কবিতায় আমি আমারই সঙ্গে কথা বলি। সে-কথাবার্তা যদি কোনদিন ফুরিয়েও যায় তবে সেই নীরব অবস্থায় আমি নিজেরই ভিতর আড়াল করবো নিজেকে। যদি পারি আত্মমগ্ন সেই অনুভবের মধ্যেও লিখে ফেলবো একটি মাত্র কবিতা। আমার শেষ কবিতাটি।

লেখক ব্যাঙ্ক

সেইসব লেখক যাঁরা নির্জনে চুপচাপ লিখে যান, কিংবা কোন লেখা কোন পত্রিকায় প্রকাশ করবেন বুঝতে পারেন না, কিংবা সঠিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে না, সেইসব লেখকদের জন্য তৈরী হলো লেখক ব্যাঙ্ক। বহির্বঙ্গের লেখকদের যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠুক লেখক ব্যাঙ্ক।

আপনার প্রিয় লেখাটি নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

প্রযত্নে : সন্দীপ দত্ত

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্র
১৮/এম্ ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নোয়ার জাহাজ

ওই যে দম্পতি, ওরা উঠেছিল নোয়ার জাহাজে।
মুখে মেখেছিল লোনা হাওয়া।
ডাঙা দেখা যাবে, এই স্বপ্ন ওরা দেখেনি কখনও।
যেদিকে তাকাত, দেখত সমুদ্রের ভাঁজে
পৃথিবী তেমনভাবে শুয়ে আছে, মাটির তলায়
যে-রকম নিজেদের আপাদমস্তক
ঢেকে নিয়ে একদিন প্রতিটি মানুষ শুয়ে পড়ে।

ওই যে দম্পতি, ওরা ঘরে
থাকার কী সুখ, তা কি জানে না? জেনেও
জলের ভিতরে ঝাঁপ দিয়েছিল উপায়বিহীন।
তরঙ্গের ভাঁজে
ওরা খুব হাবুডুবু খেয়েছিল। আর
মহাপ্লাবনের মধ্যে ওরা একদিন
হাবুডুবু খেতে-খেতে উঠেছিল নোয়ার জাহাজে।

সুনীলকুমার নন্দী

এই হেমন্তে

হেমন্ত ছড়িয়ে গেছে
জানি, তবু তুমি আছ, তোমার প্রতিভা

নিগূঢ় শক্তির মতো
মিশে আছ, মাটি–জলে ; রক্তকণিকায়

যদিও গোধূলি নামছে
যায়নি সময়, হয়তো পাথুরে দিনের যত দাহ

পায়ে পিষে হতে পারে
আমার ভুবন সেই বন্যতায় চিকন-সবুজ—

মাটি-জলে মিশে-থাকা
তোমার প্রতিভা যদি শরীরের প্রতিটি মুদ্রায়

ঘন হয়, ঘন হয়ে
রাত্রির আসঙ্গনীলে আমাকে ভাসায়!

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আগাম খবর

এই গ্রীষ্মে, আগামী বর্ষায়, খরা কিংবা বন্যা হবে,
সাংবাদিকের দুঃখ কয়েক কলাম শব্দে হবে ছাপা!
নতুন মৃত্যুর জন্য নতুন মঞ্জুরী চাই—টাকা
ওগো টাকা তুমি চাল ডাল তেল ও ত্রিপল হয়ে
সেবাশ্রমসংঘের সঙ্গে গঞ্জে চল,
এ শহরে আমরা বড় ভাল আছি! আলো না থাকলেও
হয়না তেমন ক্ষতি, আজকাল কে আর তেমন বই পড়ে
চাকরীর পাশ-পড়া ছাড়া!
সংবাদপত্রই শুধু জনসাধারণভাবে পড়া হয় ভোরে,
আঠারোর আসন্ন ভোটার সব যুবা যুবতীরা
পড়া সুরু করে শেষপাতার ক্রীড়া-কর্ম থেকে
তারপর সিনেমা পাতায় এসে কাগজটি মুড়ে রাখে
ব্যাস্—সেদিনকার মতো দেশবিবেচনা শেষ!
অথচ প্রথম পাতা, বোল্ড টাইপে যেখানে মুদ্রিত-হয় দেশ
প্রাক্ বা প্রথম আঠারো সেখানেতো একবারো থামেনা!
সংবাদের বেশীর ভাগই আজকাল দুঃসংবাদ
না পড়েও তাদের কি খুব ক্ষতি হচ্ছে!
বিবেচনা করুন পাঠক, কোটিমুদ্রার বাধ রয়েছে বন্যা হবেই হবে তবু,

ডিপ টিউবওয়েল আটকাতে পারে আর কতটুকু খরা।
মানুষের শয্যাবিনীত বেঁচে থাকা
মানুষের চুপ মরে যাওয়া
এখনো এদেশে শুধু যৎসামান্য ছোট টাইপে
দৈনিকের এক কোণে মুখ লুকাতে আসে!
রাজনৈতিক খবর ছাড়া হেডলাইন-খবরের কোনো নৈতিকতা নেই!

এই তবে হলো গিয়ে সহজ কথায় লেখা স্বাধীনতার বেয়াল্লিশ বছর,
হে নতুন সবে–আঠারোর টাটকা ভোটদাতা
না-ওঠা কালিতে নখ ভেজাবার আগে
দেশের মানচিত্রটি নিজে দশবার আঁকো,
ভোট দেবার আগেই তোমাকে প্রশ্ন করা হবে
"স্বাধীনতার" অর্থ তুমি অভিধান খুলে দেখে নিয়েছে কিনা?

একমাত্র ঐ খানেই এ-দেশের স্বাধীনতা আছে!

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃত অশ্রুর সামনে

বিকেলের তেরছা রোদ দেওয়ালে পড়তেই
ঘরের মধ্যে সারি সারি শালগাছ উঠে দাঁড়ালো
সে সবের পাতা ভেদ ক'রে
মাটির ওপর অজস্র রূপোর টাকা ছাড়তে লাগল রোদ
বাকিটা ছায়ার দখলে থাকে সমান সমান

এ ভাবেই একদিন ঘরদোর দেওয়াল মুছে যায়
অসামান্য বিকেল এসে ডাকলে
প্রকৃত অশ্রুর সামনে নত হই।

শিবশম্ভু পাল

যৌথ পরিবার

গোটা বাড়িটায় মাত্র একটাই থার্মোমিটার
একবার এর গায়ে, একবার ওর গায়ে, একতলা থেকে দোতলায়
প্রজন্মচক্রের নেমি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঘুরে আসে, জ্বর দ্যাখে ছ-খানা ঘরের
ছোট ছোট ইতিহাসে, কার কত চাপা জ্বর, কার-বা প্রকট—
প্রতিরোধ মেপে যায়, জয় কিংবা পরাজয়, চিনির হিশেব,
মাছের সাইজ থেকে প্রতিতুলনার ভাইরাস
কয়লার ধোঁয়া থেকে উড়ে যায় মন্থরার নিশ্বাসকণিকা
তেজস্ক্রিয় ফল-আউট, পর্দার আড়ালে ওঠে ঘুসঘুসে জ্বর
পারা চড়ে ১০৩, রেশনকার্ডের পুরু গোছার গার্ডার
ছটফট করে ওঠে। সেইসব খবরের স্কুপ পেয়ে ফুতিতে ভাতের
হাঁড়িটা উথলে যায়, টগবগ টগবগ, ছন্দ ঠিক আছে;
মাত্রার খামতিটুকু পুরে যায় একখানা ঘরে যদি কম থাকে জ্বর
অন্য ঘরে একশর বেশি; আর এরকম মাত্রাভেদ ঘটে
তৃতীয় প্রজন্ম যদি তারস্বরে কেঁদে ওঠে, খিলখিল হাসে
নীচের তলার ঘরে, শাশুড়ির কোলে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নদীর স্বভাবে

পর্বত চিরে নামতে নামতে
উপত্যকায় নদীর স্বভাবে
তরল ক্ষমায় সঁপেছি নিজেকে সাগরে;
প্রতিফলনের ক্রোধে মহাকাশ গর্জায়।
নাকি সবই শুধু রাজশেখরের ধুস্তুরি মায়া,
রয়েছি যে-ঘরে সে-ঘরেই!
প্রবীণ অস্থিমজ্জায়
কেন এত লোভ কেন হাহাকারে

মেঘে মেঘে চিল চিৎকার,
দিক কালো ক'রে দিগন্ত ঝেঁপে
দামালো অশ্বক্ষুর,
পাথরে লোহায়
বাসনায় ঝাঁ ঝাঁ শীৎকার।

সত্যি মিথ্যে জানি না,
এমন অবতরণের খেলায়
আজ ঝাঁপ দিতে হবেই যুযুৎসবে,
কাঁধে কাঁধ দিয়ে পৌঁছতে হবে
সিদ্ধির গৌরবে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অগ্নিবলয় (১)

উসকে দেয় আগুন, তার দুপাশে পোকা ওড়ে—
ঝাঁপিয়ে যদি পড়ে পড়ুক, পুড়তে হ'লে পুড়ুক,
ঘুরুক হাতে তাঁতের শাড়ি ঝলমলানো আলো,
সবই দাহ, সবই আগুন, শুদ্ধ হয় কারা?

এসে যে আমি পড়েছি তাতে অনেক কিছু দেখি,
আকাশ এসে ছুবলে দেয় মেঘেলা রং মাটি—
মালসাভরা পিদিম আছে, সেখান থেকেই শুরু—
গুরুগুরু ওপর থেকে গুমরে ওঠে আকাশ।

আছে আগুন সামনেদিকে, পোকারা তাই আসে—
পেছনে যারা আছে তারাও একটু একটু আলো,
জ্ব'লতে এসেছিলাম তাই জ্বলছে পুরোপুরি,
ভেবেছিলাম পুড়ি একাই, এখন দেখি সবাই

একসঙ্গে পোড়ে, যেন কাঠকুটুনি, পাতা
দুলতে দুলতে হাওয়ার টানে দপদপিয়ে কাঁপে,
অন্ধ কেউ কখনো নয়, সবাই তাই দেখে
কীভাবে পোড়ে পোকামাকড়, কীভাবে পোড়ে মানুষ!

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

তট

১

বেলাভূমি
যেন এক ম্যারাথন রেস

অথবা ঘোড়ার পা
সবকটা শুশ্রূষে তোলা প্রবল ধাবনে

আমাকে পিছনে রেখে
জলের গভীরে নেমে গেল ...

২

গাঢ় ময়ূরের মত পেখম ছড়িয়ে
সাগরের দূরান্তিক জল

সূর্য ডোবে...

একদিকে বালিয়াড়ি
অন্যদিকে ঝাউ
মাঝখানে নুলিয়া ছেলেটি

মাথার টুপিতে তার
করবীশীর্ষের মত আগুন লেগেছে।

দেবারতি মিত্র

দয়ালু রাজা

কাকিনী পত্নীর মৃত্যু বার্ষিকীতে এক রাজা
পিটুলি গাছের ডালে নেটে কলসি বেঁধে
মেঘ আর কেকাস্বর আঁকলেন,
টানলেন বনের কাজল
যাতে বর্ষা আসে।
সারাটা বচ্ছর তাতে বৃষ্টি জমে থাক।
ইহজন্মে কাকেদের বড় কষ্ট ;
অন্তত মৃত্যুর পরে
গ্রীষ্মকালে ফুটিফাটা রোদে
ঠোঁট মাথা পর্যাপ্ত ডুবিয়ে জল খাক,
এই বাঞ্ছা তাঁর।
মানুষ ও অমানুষ এবং
আরো নানাবিধ পত্নী ছিল দয়ালু রাজার।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

দেবীপক্ষে লেখা কবিতা

১

কিছু অন্ধকার ছিল কাল। আর ভীষণ ভূতের ভয় ছিল।

গোধূলিবেলায় আজ গৌরপ্রাঙ্গণের পথে হেঁটে যেতে যেতে
চুলে ঝরে পড়ে বৃষ্টিজল, আকাশের দিকে মুখ তুলি, ফের
প্রাণভিক্ষা চাই।

২

টেবিলঢাকায় গুঁড়ো মরিচের মত রক্তকণা—
কারা বসেছিল কাল, কার ভোররাতে ডানা নেড়ে
অভিশাপ ছুঁড়ে দিয়ে, গরাদ সরিয়ে উড়ে গেছে !

এবার ফুটেছে আলো, এবার তোমার কাছে যাবো !

৩

'চিঠি পাবে' জানিয়ে নীরবে তিনি পূর্বপল্লীতে হেঁটে গেলেন।
এখানে অজস্র হাসি, গান আর রঙিন শিশুর ভালোবাসা—
বর্ণময়তার পাশে বসে বসে জ্বেলে রাখি টর্চ,
হাই ওঠে ... অন্ধ জীবনের কথা ভাবি।

৪

শুধু তোমারই জন্য এই রাত্রির কবিতা লেখা শুরু হোলো।
শুধুই তোমার জন্য আজ অমাবস্যার মত নিকষ অশ্বটিও
মন্ত্রমুগ্ধ, নদীবুক থেকে উঠে এসে
অবিবাহ প্রণয়ের গোপনতা ঢেকে দিলো তুমুল হ্রেষায়, ধুলোঝড়ে।

৫

দেবীকে দেখোনি তুমি,
ঝলকে ঝলকে কাঁচা অন্ধকার মুখ থেকে বুক থেকে উগড়ে দিয়েছো।
উল্টোনো পায়ের ছাপ মুছে, আবার মানুষজন্ম হলো তবে ;
লোহা ও তামার মুদ্রা সঙ্গে নেই, ছুঁইনি আগুন—
দেয়ালে উপুড় ভাঙ্গা চাঁদমালা আমার এ-পথ আলো করে।

পথনাটিকা

তেল ফুরোনোর আগে শেষবারের আলো হয়ে উঠলো সাজঘর। কলি ফিরলো দেওয়ালে। কনস্টাবওয়ালারাও এখন ট্রামরাস্তায়। কাজ রেখে, আমি নিপুণহাতে তোমার জন্য বানিয়ে দিলাম বরফ মেশানো পানীয়। এসো প্রিয়সখা, তুমি আর অরণ্যচারী নও। গুলি-খাওয়া বাঘের মতন তোমাকে, ফুঁসে ওঠা তোমাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে আমাদের শুশ্রূষা সকল। বাঁচো। জাগো। তারপর জমিয়ে তোলো আজ সন্ধেবেলাকার নাটক। আগুন ও পতঙ্গের খেলা যেমন মেটে তেমনই, স্বচ্ছ কাঁচের মতন শিরা ওঠা পাখা পুড়িয়ে আমি দেখবো তোমাকে। দেখবো, ফ্লাডলাইটের শাদা তরঙ্গে ক্রমেই স্বপ্ন হয়ে ভেসে উঠছে কলাবাগানের বস্তি। দেখবো, মুমূর্ষু মানুষ গিলে খাচ্ছে রোশনাই।

প্রেমের কবিতা/দুই

এইসব টুকরো কাগজ কুচিকুচি করে ছিঁড়ি আর হাওয়ায় ভাসিয়ে দিই রোজ। পাহাড়ের মাথায়, যেখানে রাক্ষসের মিনার, যেখানে ছায়া নিজেই নিজের শত্রু, সেখানে কি এ-সব কথা পৌঁছোবে কোনোদিন? তুমিও তো নেমে আসো না আর। যদি বা আসো, চিনে লণ্ঠনের দোলানো আলোয় ভালো করে দেখা যায় না তোমার মুখ। বুকচাপা অন্ধকার আর বুকচাপা সন্ত্রাসের মধ্যে পাহাড়ে ওঠার ঝাপসা সিঁড়ি ধীরে ধীরে মেলে ধরে নিজেকে। তোমার কথা খুব মনে হয় তখন। ধুলোমাখা কার্পেটে বসে গান শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে যায় তোমার যাবতীয় লেখালিখির কথা। পাহাড়ের ওপরে ওই আলোকিত জনপদ আর নিচে এখানে এই মৃত্যু-বিরোধী উৎসব.....দুয়ের মাঝখানে ভাসতে ভাসতে আমিও হয়ত একদিন ভুলে যেতে শিখবো সবকিছু। নিজের জন্য বানানো ক্রুশকাঠে নিজেই সাজিয়ে তুলবো ঘরের দেওয়াল।

প্রেমের কবিতা/চার

রক্তমাখা ডিম ভেঙে ফেলে আমাদের না-হয়ে ওঠা মেয়ে চোখ চাইলো অন্ধকারে। সে কি এবার আমাকে মা বলে ডেকে উঠবে? জানলা না,

দরজা না, ডেটলের গন্ধে ভরপুর দীর্ঘ এক হতশ্রী পথে ভাসতে ভাসতে আমি তখন অচেতন। নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শুঁয়োপোকাদের মিছিল। ফুটপাথে, মন্দিরে, এমনকি রোলকর্ণারেও শুঁয়োপোকাদের মিছিল। আমাকে তুমি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলে, ছুঁতে নেই, রোঁয়ায় বিষ থাকে। তারপর আমাদের না-নির্মাণের নোনাধরা সিঁড়ি বেয়ে কখন যে এসে দাঁড়ালে আমার কাছে। হাত রাখলে এই ক্ষতস্থানে আর অমনি আমি জেগে উঠে দেখলুম সরু সরু ছুঁচোলো তোমার নখ। চোখের কোটরে হাড়কাঁপানো সবুজ আগুন। ছায়া পড়ে না মেঝেয়। আজ সমস্ত শুঁয়োপোকার স্রোত পৌঁছে গেছে আমার ঘরে, দুধশাদা বিছানার ঠিক পাশটিতে। রোঁয়া উড়ছে বাতাসে। আনন্দ কিংবা বিষাদের জন্য এই সবকিছুই তো আমরা চেয়েছিলুম একদিন। কে যেন একটা বোরখা দিয়ে ঢেকে দেয় আমার শরীর। পরম নিশ্চিন্তে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছি.....

রূপকথা

কলকাতাকে নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে এতোকাল—
আর তাদের গায়ে মাখায় রিলিফের কাজ হয়ে ঝুলে থেকেছে মানুষের চোখের জল।
হাঁসের ডিমের মতো, কলকাতার এই শক্ত খোলস ভেঙে
আমি আজো ওর ভেতরে ঢুকতে পারিনি।
দূরে বসে বসে
কখনো রক্তের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলি,
কখনো চিনে বাদামের খোসা বাতাসে উড়িয়ে হেসে উঠি গাঢ় লাল চোখে।
জানো কি, কলকাতাও মাঝে মাঝে রাজকন্যা হয়ে উঠতে চায়!
যখন জ্যোৎস্না এসে তাড়িয়ে দেয় মেঘ,
সে তখন বাক্স ঝেড়ে বার করে আনে তার গোপন পোষাক, আর
মাটির তলায় পুঁতে রাখা প্রিয় ঘোড়ার মাথা।
তারপর, মাদার গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে.....

ট্রেঞ্চ

আমাদের গুমোট দিনরাতের খুব দিব্য বর্ণনা এইসব ফুলস্কেপ খাতার
পাতায় নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে তোমরা। কিভাবে, কাঁকড়ার দাঁড়ার আঘাতে
বিমিয়ে যাচ্ছিলো ক্ষতমুখ, কিভাবে আমাদের বান্ধবী, হ্যাঁ, সেই মেয়েটি,
যে হেসে উঠলেই মুক্তো ঝরে পড়তো, তার চোখের তলায় উঠে এসেছিলো
জীবনযাপনের কালি। বালিশের তুলোর মতন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খুঁড়ে
আকাশে বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছিলো যারা, আমাদের চারপাশেই তারা ছিল,
আমরা তালি বাজিয়ে গেয়ে উঠতাম গান—ভুবনেশ্বর হে……আর গোপন
অশ্রুপাতে ভিজে উঠতো ঘর। এইসব কথাই খুব শান্তমুখে আমরা লিখে
রেখেছি আমাদের কবিতায়। জানাতে ভুলিনি, যে কবিতাই সেই আশ্রয়,
যেখানে পৌঁছে ক্যাম্পফায়ারের আলোয় তুমি কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে
শোনো বিদেশী বাজনার ক্যাসেট। আর, দেখতে পাও, বিশাল এক অজ-
গরের হাঁ, পাণ্ডুলিপি ছাপিয়ে যে তোমার চুলের ডগাও ছুঁতে পারেনি
কোনোদিন।

দিব্য মুখোপাধ্যায়

নিয়তি

ঝিল পেরিয়ে ঝুমঝুম রাতে, অন্ধকারে ডুব মেরে ফের ঝাপটা দিয়ে দেখি
শুধু নিঃস্তব্ধ পাড়া—
বৌদি জেগে নেই তবে? ছেলেগুলো কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

একশো আট শিবের আস্তানা হয়ে থালা বাজাতে বাজাতে ফিরে আসি।

বাচ্চুর গিয়েছে চুরি; কারা খোঁজে সারারাত জঙ্গলে জঙ্গলে
শুধু ক্লান্ত হাম্বা ডাক ঘুমের মধ্যে ঢুলে পড়তে পড়তে – ঐ ঐ স্তাখ
পুরোনো মোটরগাড়ি চড়ে রাজকুমার ঝাঁপিয়ে পড়েছে তলোয়ার হাতে।

চেনো নাকি? শূন্য মাঠের পেছনে একটা নদী, সাঁকো—হুশ্
সমস্ত আড়াল
দোঁয়া, দোঁয়া, বাড়ির ভেতরে বাড়ি, ধুপরি জানালা – জঙ্গল সাফাই;

লণ্ঠন এগিয়ে যায় কুয়োতলার দিকে, ছোট হতে থাকে টিমটিমে আলো
দলছুট হয়ে
দাদা কি এসেছে নাকি মিঠে বাঁশি হাতে,—পাগলীর খোঁজে?

ঝপাং শব্দ শুধু কুয়োর ভেতর—সব শেষ, কেন এলি? কেন এলি বল?

যাত্রাপথ

গাছের ভেতর থেকে অন্য গাছে গাছে, ডাল থেকে পাতার উল্লাসে
বখাটে বেসুরো গান ছেয়ে যাবে মৃত্যুহীন প্রার্থনার রঙে
'বাঁচো' শুধু কে যে ডাকে—বলে ওঠে 'বাঁচতেই হবে'
তোমার মুখের মত জেগে থাকে স্বপ্ন এক, হুতোমের ডাক
গুমরে গুমরে ওঠে মেঘ, রেগে কালো দিগন্ত আকাশ
আজব বাড়ির ভাড়া শোধ দেওয়া হবে কি জীবনে?

বলো গেরস্তের মেয়ে, বলো ইস্কুল পালানো ছেলে
পোষ্টকার্ড, ভালবাসা এখনো কি পাও ঠিক মত?
নিশির ডাকের মত ডাকে কেউ তোমাদের রাতে?
নাকি ঘুমে, গাঢ় ঘুমে চুবে থাকো বালিশ মাথায়?
ঠেলাগাড়ি নেমে আসে এবড়ো খেবড়ো পথে, ঝড়ের সঙ্গীতে
'রিলিফ! রিলিফ! আজ তোমাদের জাগতেই হবে'

কেন কাঁদো? কেন নিঃসঙ্গ একা ঘুরে মরো পুকুরের পাশে
বুঝবে না বাঁশি আর ভুলে যাওয়া অন্ধকার রাত
ছুরির ভেতরে ছুরি, খাপে খাপ, অন্য এক ব্যথার ভেতর
গুমরে গুমরে মেঘ জমে ওঠে অবেলায় আকাশে আকাশে
ভেবে নাও, কতবার মৃত্যু হতে পারে, কত রাত্রিজাগা
তোমার চোখের পাতা, ভিজে যায় কেন প্রিয়তমা?

ঝমঝমে বর্ষার জন্য অপেক্ষায় থেকো, গুনে যেও নক্ষত্রসকল
থাকব না আর পাশে জেনে রেখো, জেনে রেখো তুমি
সাঁতরে পেরোব দীঘি, আগুনে ছারখার ক'রে অরণ্য পাহাড়
কাঁটার জঙ্গল থেকে ফুল তুলে আনতেই হবে, আমি যাবো
ডিগবাজি খেয়ে দূরে ধানক্ষেতে ভেসে যায় হাওয়া
নরম কাদার মাঠ ছুটে ছুটে দেখো আমি পার হয়ে যাই।

হাত

প্রচণ্ড পাখসাট হাওয়া
কাঁপালো ভুবন
আঁচল ওড়াল দূর ফাঁকা ময়দানে—
ইস্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়েত না পড়তেই
ছেলেগুলো
তরতর করে বেড়ে উঠে
লাটাখাম্বা গাছের গুঁড়ি ধ'রে
উঠে গেল
রাষ্ট্র বদলে দিতে কাঁচা মগডালে

ভায়েরা আমার
ট্রাক বদলে ট্রাক
চলে গেছে সব স্তব্ধ দূরদেশে ?—
নাকি ফিরে ঝুঁকে পড়বে আবার
ঘাস, ঘাসের ওপরে
হিম শীতকালে

ফেরো দিদি, ফেরো
বাড়িতে আবার
মুখ চুন করে বসে আছে 'বাবা'
কুঁই কুঁই করে কেঁদে
লেজ নেড়ে, লেজ নেড়ে নেড়ে
চেটে খাচ্ছে জল, কান্নার জল

রক্ত চটকে এসো তবে
গনগনে উনুনের আঁচে খেতলানো দু-হাত
গরম করি ফের আজ ভোরবেলা।

ফেরা

ছুটন্ত লণ্ঠনের পেছনে ফের দৌড়োচ্ছি, আমি
বাঁশবনের ভেতরে ঐ কাঠঠোকরা পাখির ডাক
শুনতে শুনতে নিধিরাম সর্দার, হুম্—
ফাটাফুটো আকাশের নীচে এক পাক ঘুরে
বাতাসকে চিরে ফালা ফালা ক'রে
এসেছি এখানে

শ্মশান এগিয়ে আসে, কাছে, নদীপার থেকে বসতির দিকে

কাদের বাড়িতে আজ আলো নেই ?
কাদের বিষণ্ণ গান শুনতে এসেছো ?

খোঁয়াড়ে খোঁয়াড়ে ঢুকে ভীষণ চেঁচিয়ে ফিরে যায়
মস্তান ভুতেরা
তাদের পতাকা নেই—খেলনা পিস্তল আছে
মুখ পুড়িয়ে আমি এইসব দৃশ্য দেখে নিতে থাকি
তারপর এক লাফে নেমে আসি চাঁদের ওপার থেকে

দেখি, মরা ঘাস
তার ওপর পা ফেলে ফেলে
ফিরে যায় ঘুমন্ত নদীর দিকে ওই দুই মানব-মানবী।

সামনে

ছোট রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে
সিগন্যাল লাল—ট্রেন আসবেনা
ছোট ছোট চায়ের দোকান
ঘুমে কাদা
কুয়াশায় ঢেকে আছে শেডের ওদিকে ফিস্‌ফিস্ স্বরে
কারা কথাবার্তা বলে—

'বাজেট উৎসব ম্লান—এল না বরষা, দেখো বরষা এলো না —
ঘেয়ো কুকুরের দল এসে
মুখে চেটে দেয় আদর জানিয়ে
কখনো চেঁচায় খুব, ঘাড়ে উঠে পড়ে
খরা ও খয়রাতি মিলে ডুবে গেছে, ডুবে গেছে ঘরবাড়ি
কাদের যাওয়ার কথা ছিল ? নাকি আসবে কেউ ?
ট্রেন এসেছিল কাল রাতে
ওরা উঠে গেছে
ভেসে গেছে সুড়ঙ্গের দিকে
শুধু মূক প্রতীক্ষায় আজ ছোট রেলস্টেশনের মাঝামাঝি
হাতে নিঃসঙ্গ টিকিট
কুয়াশায় অস্পষ্ট সব
দূর শহরের ভিড়, ব্রীজ, অলিগলি, চুম্বক আঁধার।

কবিতা লেখার জন্যে কোনো অনিবার্য বন্দুকধারণের প্রয়োজন হয় না। কারণ, কবি যখন শাদা কাগজের ওপর নিজস্ব চিন্তা এবং সংবেদন গঠন করতে থাকেন তখন তিনি ত আসলে সঞ্চার করেন নিজেকেই। চৈতালী চট্টোপাধ্যায় এবং দিব্য মুখোপাধ্যায়ও তাঁদের কবিতায় নিজেদের সঞ্চার করেছেন সহজাতবোধের ভিত্তিভূমিতে মননজাত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। বিষয়বস্তু হিশেবে প্রাত্যহিকের মুহূর্তগুলিকে ব্যবহার করেছেন তাঁরা, আর তা করতে গিয়ে কবিতার শরীর নির্মাণে যে প্রযত্ন তাঁরা দেখিয়েছেন তা নিশ্চিতভাবেই আমাদের নজর কাড়ে।

চৈতালী তাঁর কবিতার মোটিফ্ খুঁজে পান অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে। 'গোধূলিবেলায়... গৌড়প্রাঙ্গণের পথে হেঁটে যেতে যেতে' আকাশের দিকে মুখ তোলেন তিনি। যদিও তিনি দ্বিধাবিভক্ত এবং অন্ধজীবনের কথা ভাবতে ভাবতে বর্ণময়তার পাশে বসে থেকে টর্চ জেলে হাই তোলেন, অতীত থেকে বর্ত্তমানে তিনি ভ্রাম্যমাণ। মানুষজন্মেই তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর চলার পথে আর কিছু না থাক আলো করার মত 'ভাঙা চাঁদমালা' ত আছেই। 'দেবীপক্ষে লেখা কবিতা'-র পাঁচটি টুকরোতে চৈতালী এইভাবেই

বারবার অন্ধকার থেকে আলোয়, ধুলোঝড় থেকে বৃষ্টিজলে আর অভিশাপ থেকে আশীর্বাদে ফিরে আসতে চেয়েছেন।

চৈতালীর বড় গুণ এই যে, তিনি যেমন তাঁর কবিতায় পায়ে হাঁটা পথের গন্ধ, ভূতের ভয়, মরিচের গুঁড়ো, উগড়ে দেওয়া অন্ধকার—এসব অক্লেশে ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তেমনি নাগরিকতার পরুষ চাপ থেকে কবিতাকে সরিয়েও আনেন স্নিগ্ধ শুশ্রূষায়। 'অবিবাহ প্রণয়ের গোপনতা' তাই ঢাকা পড়ে যায় 'নদীবুক থেকে উঠে' আসা মন্ত্রমুগ্ধ অশ্বের হ্রেষায়। ঝলকে ঝলকে অন্ধকারও তরল হতে হতে ভোর হয়ে ওঠে নতুন জন্মের আলোয়।

তাঁর পরের পাঁচটি কবিতার চারটি টানা গদ্যে লেখা। এগুলিতে তিনি নিজেকে পাল্টেছেন। শুধু আঙ্গিকের দিক থেকেই নয়। কি শব্দবন্ধের আধুনিকতায়, কি চিত্রকল্পের বৈপরীত্যে অথবা তির্যক প্রকাশের ভেতর দিয়ে চৈতালী বেশ সফিস্টিকেইটিড। তাঁর কবিতায় 'ফ্লাডলাইটের শাদা তরঙ্গে' কলাবাগানের বস্তিও স্বপ্ন হয়ে ওঠে (পথনাটিকা)। পাহাড়ের মাথায় 'আলোকিত জনপদ' আর নিচে 'মৃত্যুবিরোধী উৎসব'-এর মাঝখানে থেকে তিনি সব ভুলতে চান। কারণ তিনি নিজের জন্যে বানানো ক্রুশকাঠে সাজিয়ে রেখেছেন নিজের ঘর (প্রেমের কবিতা/দুই)। চৈতালী বিশ্বাস করেন এই আত্মবিনাশের ভেতর দিয়েই কবিকে উত্তীর্ণ হতে হয়। উত্তীর্ণ হতে হবে তাঁকেও।

তবু, এই উত্তীর্ণ হওয়ার আনুপুর্বিক ইতিহাসটুকু তিনি আমাদের দেননি। কারণ, 'প্রেমের কবিতা/দুই'-এর পর আমরা পাচ্ছি 'প্রেমের কবিতা/চার'। সিরিজের প্রথম এবং তৃতীয়টি না থাকায় আমরা একটু আড়ালে পড়ে যাই না কি ? আর তাই, এগিয়ে যাওয়া এবং পিছুটানের অনিবার্যতায় তাঁর মধ্যে সবকিছু থেকে ছিঁড়ে নিজেকে বার করে আনার যে অন্তর্তাগিদ গড়ে উঠেছে তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট অবয়বে ধরা দেয় না।

আরও একটা কথা, 'রক্তমাখা ডিম ভেঙে ফেলে আমাদের না হয়ে ওঠা মেয়ে' 'রোল কর্ণারেও শুঁয়োপোকাদের মিছিল', 'না–নির্মাণের নোনাধরা সিঁড়ি' (প্রেমের কবিতা/চার)—পালিশ আছে অবশ্যই। হতাশা আর অবক্ষয়ের ছবিটাও বেশ পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বড় বেশি নঞর্থক নয় কি ? কোথায় পৌঁছতে চাচ্ছেন তিনি ? অথবা, তিনি কি তাঁর স্বপ্নের জগৎটিকে—সেখানে তিনি 'একটা বোরখা' দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চান (প্রেমের কবিতা/চার), অথবা, 'বিশাল এক অজগরের হাঁ' যেখানে 'পাণ্ডুলিপি ছাপিয়ে.....চুলের ডগাও' ছুঁতে পারে না (ট্রেঞ্চ)—

অনির্দিষ্ট করে রাখতে চান, শব্দকটি শুধু ফেলেই দেন, ধরে নেওয়ার ভার আমাদের। তবে সবসময় ধরা যায় কি ?

ফ্রি-ভার্সে লেখা তাঁর পঞ্চম কবিতা 'রূপকথা'য় তিনি ফিরে গিয়েছেন 'দেবীপক্ষে লেখা কবিতা'র রোমান্টিক আবহেই। যদিও আগেরটির তুলনায় এটি বেশ তির্যক। কিছু ভাল কাজ আছে, যেমন 'রিলিফের কাজ হয়ে ঝুলে' থাকা 'মানুষের চোখের জল' এবং জ্যোৎস্নালোকে 'বাক্স ঝেড়ে বার করে' আনা 'গোপন পোষাক'। 'মাটির তলায় পুঁতে রাখা প্রিয় ঘোড়ার মাথা' অবশ্যই গ্রোটেস্ক্। তবু কবিতাটির পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছে 'রূপকথা' নামটি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

দিব্য মুখোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি বেশ ছিমছাম। কোনোরকম পরিকল্পিত ধুম-ধাড়াক্কা অথবা রাংতাজড়ানো চেকনাই দিব্যকে টানে না। তাঁর কবিতার পরিমণ্ডলটি ঐতিহ্যঘেঁষা এবং আইডিলিক। দিব্য তাঁর সহজাত বোধ এবং সহমর্মিতার ভিতে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে বিন্যস্ত করতে চান কবিতার শিল্পে। 'বলো গেরস্তের মেয়ে, বলো ইস্কুল পালানো ছেলে/পোষ্টকার্ড, ভালবাসা এখনো কি পাও ঠিকমত ?' (যাত্রাপথ) অথবা 'ফেরো দিদি, ফেরো.....মুখ চুন করে বসে আছে 'ঝাঁঝা'/কুঁই কুঁই ক'রে কেঁদে/লেজ নেড়ে, লেজ নেড়ে নেড়ে/চেটে খাচ্ছে জল, কান্নার জল' (হাত)। কবিতার গা থেকে খুলে নিলে নিতান্ত আটপৌরে, গার্হস্থ্য ছবি। কিন্তু দিব্যর কলমের ঈষৎ চাপে দৈনন্দিন মালিন্য থেকেই তুলে আনা 'গেরস্তের মেয়ে', 'ইস্কুল পালানো ছেলে'র মত স্ল্যাং শব্দবন্ধও 'পোষ্টকার্ড, ভালবাসা'র ভাবানুষঙ্গে কী তাৎপর্যমণ্ডিত না হয়ে উঠেছে। দিব্যর পাঁচটি কবিতার প্রথম 'নিয়তি'র শেষ পংক্তি : 'ঝপাং শব্দ শুধু কুয়োর ভেতর—সব শেষ, কেন এলি ? কেন এলি বল ?'—আত্মহত্যা এবং হাহাকার—নিয়তি অবশ্যই। কিন্তু দিব্যর শিল্পস্বভাবে মানুষের সামাজিক দায়দায়িত্বের সমস্যাটিও দাগ কেটেছে, আর যেহেতু তার ক্রমশ-ক্ষয়ে-যাওয়া জৈবিকতা বাঁচার তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলেছে, দিব্য নির্মম, অথচ শিল্পকর্মের শর্ত মেনে নিয়তির হাতেই তাকে সমর্পিত করেছেন ঝুমঝুম রাতের শব্দ থেকে একটু-একটু করে গড়ে তোলা 'ঝপাং' শব্দের ক্রিসেণ্ডোয়। কিন্তু সামঞ্জস্যবিধানে তিনিও ত আগ্রহী। তাই, 'বাঁচো', 'বাঁচতেই হবে' ডাকের দুরান্তিক অনুসরণে কাদার মাঠ পার হয়ে তিনি কাঁটার জঙ্গল থেকে ফুল আনতে যাবেন।

কাটা, কাটা, টুকরো ছবি, শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের পারস্পরিক অভিঘাত, শাদামাটা ক্রিয়াপদের তুলকি চালে দিব্য মামুলি বিষয়বস্তুকে বাজিয়ে দিতে পারেন। তাঁর 'ফেরা' কবিতায় 'ফাটাফুটো আকাশের' তলা থেকে 'বাতাসকে.....ফালা ফালা ক'রে' নিধিরাম সর্দারের বেরিয়ে আসা অথবা মস্তান ভূতেদের চেঁচাতে-চেঁচাতে ফিরে যাওয়া ত চমকে ওঠার মত কোনকিছুকেই সাব্যস্ত করে না। কিন্তু যখন তিনি মরা ঘাসের ওপর 'পা ফেলে ফেলে' মানব-মানবীর ঘুমন্ত নদীর দিকে যাওয়ার কথা বলেন তিনি ত তাঁর ইপ্সিত সমপ্রতায় পৌঁছে যান। গুণগতভাবে কবিতার মানসতা বদলে গিয়ে অভিমুখী হয় সমাজসংসারের সবকিছুর সামঞ্জস্যবিধানে।

যেন থাকা দরকার ছিল এমনই কিছু হালফিলের প্রসঙ্গ - বাজেট, খরা, খয়রাতি ইত্যাদি এবং প্রতীকার্থে না আসা ট্রেনের জন্যে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে মূক প্রতীক্ষার সামনে কথা থাকলেও দিব্যর পরিপ্রেক্ষিত আসলে কুয়োতলার নির্জনতা থেকে শুরু করে অনুন্নাদ, অনুমিল প্রাকৃতিক ব্যাপ্তি এবং বিস্তার। অতীতছায়াচ্ছন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠায়। অতীত-বর্তমানের পুনর্মূল্যায়নের তাগিদে। মনে হতেই পারে দিব্য যথেষ্ট আধুনিক নন। আরব্যানিটি নেই তাঁর কবিতায়। কিন্তু যে কবিতা মরমী অথচ ইশারাময়, বান ডাকায় না, আমাদের ভেতরে চলাৎ করে ঢেউ তুলে সঞ্চারিত হতে থাকে আর অবয়বে ফুটিয়ে তোলে আত্মগত আদল তা আমাদের মজিয়ে রাখে বহুক্ষণ।

—অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্রত চক্রবর্তী

কোনো বন্ধুকে

কী ছবি চাইছ ?
শাসি ভেঙে চুরমার।

যেসব পাথর তুমি ছুঁড়েছিলে,
মাথা বাঁচাবার দায়ে সরে গেছি।
শাসিতে লেগেছে।

কাচের প্রতিটি টুকরো আমাদের পুরনো দিন
কাচের প্রতিটি টুকরো আমাদের পুরনো রাত্রি
সময় কোথায় এখন কুড়িয়ে তুলব !

শাসি ভেঙে চুরমার,
তবু মুখোমুখি বসি, এসো। চা হোক।
কুশল বিনিময় হোক্ স্বাভাবিক।
দুজনেই নাগরিক, সম্ভ্রান্ত বলেই লোকে জানে।

দুজনেই ভুলে গেছি ডাকনাম
কী জানি কী ছিল।

মুসৌরী ১৯৮৯

শীতল প্রেমিকা ;
জাগালে জাগবে শিরশ্চুম্বনে।
কিন্তু এই শৈলশহরে আমি
স্রেফ রাত্রি ছুঁতে এসেছি,
কোথায় রাখব চুম্বন, জানিনা ;
তাই জাগানো হলো না।
হোটেলের জানলার
কাচের শাসিতে শাসিতে
যে পাহাড় চমকাচ্ছে,

যে হিম নৈঃশব্দ
দস্তানা খুঁজছে আমার উষ্ণতার,
যে উঁচু-নীচু রাস্তা
চড়াই-উৎরাই শেখাবে ব'লে
হাওয়ায় ইশারা পাঠাচ্ছে ঘনঘন,
আমি ওদের প্রত্যেক ব্যাকুলতাকে
ধন্যবাদ বলছি।
আমি এই রাত্রি ছুঁয়ে
কাচের শাসিতে শাসিতে চোখ রেখে
শরীর ভঙ্গীমা দেখছি,
ভাষা শিখছি,
ব্যাকুলতার।

ভোট

পতাকার জামা-পরা একজন মানুষ এসেছিল।
তাকে অপ্রস্তুত করেছি।
ফিরছে।

ঝুঁকে
ঘাসের মাথার মুকুটে
শিশিরের মুক্ত ছুঁতে চাইছে একটা ভোরবেলা।
ওর ইচ্ছের ব্যালটবক্সে
ভোট দিলাম একটু আগে।

প্রায় গা-ঘেঁষে
সদ্য ঘুমভাঙা হাইওঠা একটা মাছধরা নৌকো
জেলেরা সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে।
আমার ভোট রইল ওদের পায়ে পায়ে,
পায়ে পায়ে, পায়ে পায়ে।

গাছপালার আড়ালে চাঁদ ওঠার মতন
মৃদু একটা সম্পর্ক
ক্রমশ যেন আভাময়। টানছে।
জ্যোৎস্নার নিঃশব্দ স্লোগানে কখন
গলা মিলে গেল,
আমি নিজেই জানি না!

চন্দন চন্দন

(শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়কে)

উচ্ছন্নে যাবার দিন হেলায় হারিয়েছি,
তাই আজ মাপসই তলোয়ার, খাপে।
আশি তছনছ ক'রে পারদের বিষে
মরিয়া মরিনি বলে আজ এই
শান্ত স্থির ছবি দর্পণ দখল ক'রে, একা।
সেই জ্বরতপ্ত তীব্র রৌদ্রদিন, বেয়নট খোঁচার মতো
বাড়াবাড়ি শীত, অভব্য বৃষ্টির ঝাপট
পাঞ্জাবী বোতামহারা জেনে বুকে এসে
দলিতমথিত করে নিজেদের গল্প দিয়ে গেছে।
আজ এতদিন পর লক্ষ্যগোচরের ভাষা
পড়েছ নিজের ক'রে, তরুণ অনুজ;
পাঠালে চন্দন; চন্দন চন্দন গন্ধ
বোতামের থেকে ভেসে স্মৃতিতে ফেরাল।
এখন নিশ্চিন্তে একে বোতামের ঘরে ঘরে
পৌঁছে দিচ্ছি, কেননা এখন
পুরনো বোতামহারা আমার পোশাক তোমরা পরেছ!

সুবোধ সরকার

চিহ্ন

তুমি দেখো, চিহ্ন ধরে সবাই ফিরবে, শুধু আমি ফিরবো না
বালিতে জ্যোৎস্না দেখে মনে হবে যেন পিঠ ঘুমন্ত এখনো
আমি সেই স্তব্ধ পিঠে হাত রেখে ডাকবো তোমাকে ওঠো, ওঠো
একটি নৌকো নিয়ে দস্যু উঠে হয়ত দাঁড়াবে, মাঝরাতে
নৌকো যাকে স্পর্শ করে সে আর ফেরে না।

চিহ্ন ধরে চিহ্ন ধরে সবাই ফিরবে আর আমি ফিরবো না।
তুমি চিহ্ন বলে দাও, দস্যু তুমি নৌকো ফেরাও
নৌকো ফেরে না, নৌকো শুধু ছোটে, কোন্‌দিকে ছোটে তুমি জানো?
যেদিকে অনেক নৌকো, যাদের ফেরার কোন পথ জানা নেই
হে জ্যোৎস্না, হে নৌকো তোমরাই শেষ কথা, আমি তবে হারিয়ে গেলাম?

আত্মা

আত্মা বলে কিছু নেই। তবু দেখি আমার আত্মা
তোমার বাড়িতে ঢোকে, তোমার দুহাত ধরে বলে
আমাকে পানীয় দাও, খাদ্য দাও, আমি বহুদিন
অভুক্ত রয়েছি।

তারপর সে তোমার
ভাতে মুখ দেবে, লাল পাপড়ি সরিয়ে সে তোমার
স্তনে মুখ দেবে, সে তোমার নাভি থেকে
ঘুমন্ত ঘাসের ফুল জাগিয়ে তুলবে, সে তোমার
যেখানে যেখানে মুখ দেবে সেই সব স্থানে চিরস্থায়ীরূপে
চিহ্ন রেখে যাবে

আত্মার বদলে আমি নিজে একদিন
দাঁড়াবো তোমার ঘরে
তারপর

আমাকে কিভাবে নাও সেটাই দেখার
ভূত দেখবার মতো আমাকে ধাক্কা মেরে তুমি কি পালাবে ?

প লিও না, আমি সেই স্কুল মাষ্টারের ছেলে, জলদস্যু নই।

মাষ্টারের ছোট ছেলে

মাষ্টারের ছোট ছেলে বলে আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি
তোমাকেই চাই আমি, তোমাকে না নিয়ে আমি স্থলভূমি ছেড়ে
কোথাও যাবো না। দূরে তোমার নৌকো যত দূরে চলে যাবে
আমার ততই লাভ, যে আছে দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে থাকতে দাও
তাকে, দাও তাকে অন্ন পরমান্ন সব, কিন্তু তাকে আমাদের
জলযাত্রার কথা কখনো বলো না, জল থেকে যাত্রা শুরু
ঝিনুকের, প্রবালের, রুটির সন্ধানে সেই মহামানবের
মাষ্টারের ছোট ছেলে বলে আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি
তোমাকেই আমি চাই পিঠের অস্থি-র মতো নৌকো ঘুরছে
তোমাকে না নিয়ে এই জলযাত্রা কোনদিন সম্পূর্ণ হবে না।

নির্মল হালদার

মধ্যবিত্ত

লাউলতা কুমড়ালতায়
ঝড় এসে ফিরে যায়
তুলসী গাছেও ঝড় এসে ফিরে যায়
কোনো ঝড় মাথায় নিলাম না
আঙুল ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে এই ভয়ে
দু'হাতে নিলাম না।

যদি আমার নিঃশ্বাস থেকে ঝড় ওঠে কোনোদিন
যদি চলতে গিয়ে ধুলো ওঠে চারদিকে
আমি কি ঘরে ফিরবো আবার ?

মায়ের কাছে

চালে পা পড়লো
কুলোতে চাল ছিল পা প'ড়ে গেল
ক্ষমা চাইবো না কারো কাছেই

ছোটো বেলায় মায়ের কোলে-কাঁখে
কতো লাফ ঝাঁপ করেছি
আমার পা লেগেছে মায়ের চোখে মুখেও

আমিতো এখনও মায়ের সেই ছোটো ছেলে

প্রকৃতি

আমার মা-বাবা নেই ঘর-দুয়ার নেই
আমি কি অনাথ ?
সূর্য আজও আমার কাঁধের কাছে
এসে দাঁড়ালো, আমার মুখের দিকে চেয়ে
চাঁদ ওঠে প্রতিদিন
আমাকে অনাথ বলবে ?

প্রকৃতির এই স্রোতের মধ্যে কোনো না কোনো মানুষ
গামছা বাঁধা চিড়ে খুলে জলে ভেজাচ্ছে
সেও জানে, আমার পথেও ধুলো আছে

এরপরেও কি, আমাকে অনাথ বলবে ?

সুজিত সরকার

অন্তহীন

প্লাবনের জলে
পুকুরের মাছ
নদীতে পৌঁছয়,
নদী থেকে কখন সমুদ্রে।

কিছুই বোঝেনা মাছ—
শুধু এইটুকু বোঝে
তার সাঁতারের কোনো শেষ নেই।

সমস্ত আকাশ দেখতে চাই—
তাই,
নির্জন বারান্দা থেকে
আমিও এসেছি কবে যেন
মহাপৃথিবীর পথে।
কিছুই জানিনা আমি—
শুধু জানি,
আমার চলার কোনো শেষ নেই।

উপলব্ধি

১. নিজেকে বঞ্চিত ক'রে যিনি দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত উদার।

২. স্থিরতাই জ্ঞানের উৎস।

৩. ভুল প্রতিযোগিতায় মানুষ নিজেকে অসুন্দর করে।

৪. সব জিজ্ঞাসা পেরিয়ে চিরদিন অনন্ত স্তব্ধতা.....

নাম মিলিয়ে যায়

আমার নিজের নাম থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে
ভোর আর সকালের মধ্যবর্তী আলোয় দাঁড়িয়ে আছি
পৃথিবীর বিশাল প্রান্তরে—

ধোঁয়া যেমন মিলিয়ে যায় শূন্যতায়
তেমনই আমার নাম মিলিয়ে যায়
ঘাসের সবুজে, আকাশের নীলে—

নিজেকে মেঘের মতো নির্ভার, বিশুদ্ধ মনে হয়।

হাওয়া

শুধু আসা, শুধু যাওয়া
হাওয়া, হাওয়া।

বাঁশিতে ঢুকলে সুর হয়ে যায়
বেলুনে ঢুকলে বেলুন উজ্জ্বল হয়ে যায়
হাওয়া, হাওয়া।

আগুন বাড়ায়,
আবার সমস্ত পুড়ে গেলে
ছাইটুকু নিয়ে চ'লে যায়
হাওয়া, হাওয়া।

যতোই আঁকড়ে ধরো : 'আমার' 'আমার'
কিছুই যাবে না পাওয়া
হাওয়া, হাওয়া।

বিপুল চক্রবর্তী

মাঠ

মাঠের বাতাস এলো ধান দূর্বা নিয়ে
বাতাস নিলাম বুকে
ধান দূর্বা নত হ'য়ে মাথায় নিলাম

বাজো শঙ্খ বাজো শঙ্খ বাজো

খেজুর গাছের মতো
সারি সারি ভাঙাচোরা মাঠের মানুষ

আর এই দৃশ্যের আড়ালে
খেজুর কাঁটার কথা, খেজুর রসের গূঢ় কথা

খরায় ফেটেছে মাটি

মায়ের শুকনো কাঁখে
রসের হাঁড়ির মতো তবু
কি ক'রে যে ভ'রে ওঠে মাঠের শিশুরা

মাঠজল ভেঙে যে মানুষ রাত্রি জুড়ে হেঁটে যায়
মাঠের সকলে তাকে জানে

ডান হাতে মেঘ তার বাঁ হাতে বিদ্যুৎ
সে মাঠপুরুষ

আলকেউটেও তাকে পায়ে পায়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়

তেচোখা মাছের মতো
নক্ষত্রেরা সারারাত খেলা করে মাঠের শরীরে

তারপর, ধানে দুধ আসে

বাতাসে বাতাসে
পরীদের নগ্ন অভিযান, নক্ষত্রের

শস্যের মর্মর থেকে
উঠে আসে সুর, মাটির মাদল

বিকেল গড়ায় আরো
আরো আরো বিকেলের দিকে

পাখির শিষের পাশে
মাঠে আজ শিষচোর শিশুরা এসেছে

শিষ ওড়ে নখে নখে
শিষ ওড়ে আকাশে আকাশে

কাদাজল ছেনে যে মেয়েটি মাছ ধরে
মাছের আঁশের মত পিঠ তার

মৎস্যকন্যার কথা সে কি জানে

মাঠ-ও খোলস ছাড়ে

তখন চড়ুই, টিয়া, পায়রার আনাগোনা বন্ধ হ'য়ে যায়
তখন শুধুই খড়, নষ্ট ডিম, ইঁদুরের গর্ত জেগে থাকে

হা মাঠ হা মাঠ তুমি কোথায় লুকোলে

তারপর, আবার বর্ষায়
আদিগন্ত সবুজ ফণায় মাঠ মাঠে ফিরে আসে

মাঠ মানে অন্তহীন প্রাণের প্রবাহ
মৃত্যু আসে, নতমুখ মৃত্যু ফিরে যায়

বন্যা খরা হিরোশিমা শেষ হ'য়ে গেলে
আবার প্রাণের শিষ সবুজ-দুর্বায়

আহত মাটিতে নামে গানের পাখিরা
দূরে উনুনের ধোঁয়া আবার আবার

সেদিন কুয়াশা ছেঁড়া তোমার উৎসব

দুলে ওঠে লক্ষ লক্ষ লাঙলের ফণা
বজ্র হাতে হাতে

সেদিন তোমার পাশে
আমার কলম যেন বল্লমের মতো হয়ে ওঠে

আমি কোনোদিন কোনো মন্দিরে যাইনি
মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছি

তোমার লাঙল ধোয়া জল
তোমার ধান ও দুর্বা মাথায় ছুঁইয়ে

গেয়েছি মাঠের গান
গাইবো মাঠের গান, মাঠমঙ্গল

জহর সেনমজুমদার

জন্মপ্রবাহ

উন্মাদ-আশ্রমের শাদা হাড়
উড়ছে শূন্যে। ঘুম
আর কান্নার সাপ এসে
ছোবল দিতেই
আমরাও মাঠে মাঠে ধান হয়ে ফলি

বৃষ্টিপ্রবাহ

মাথার ভিতর কোনো দেবতা নেই
একটি বিছানা পাতা আছে
ঘাসে—প্রথম সন্ধ্যা। জন্মচাষার
গা থেকে বৃষ্টি পড়ছে।
ধরণী দু-ফাঁক। মা, আজ
হলুদ পাতাগুলি রান্না করছেন ;

আনন্দপ্রবাহ

শাদা হাড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছে
ঘরের খিল। ইন্দ্রিয়নির্ভর
উনুনের কথা বলবো আজ।
উড়ছে ছাত্রী। উড়ছে ছাত্র।
মহাশূন্যে উড়ছে আনন্দ-পাঠশালা ;
শাদা হাড় ধরবার জন্য
নিচে কাপড় পাতা। আকাশে
শালপাতার পাখি

আলোপ্রবাহ

উঠোন নাচে। মহিষের শিঙের ওপর
একটি ব্যাধ। গা ছমছম করে।
রান্নাঘরের ভাজা মাছ হেঁটে আসে
পুকুরের দিকে। বাতাসে একজন
উন্মাদের চোখ উড়ছে। আলো দাও। আলো খাব

মৃত্যুপ্রবাহ

আদিম লালা। মা দোল দেয়
অথৈ জলের দোল।
বিকালের গলায় দা-য়ের কোপ।
কোদাল বাজছে। লাঙল বাজছে।
মেঘমোহ। আকাশে অজস্র প্রদীপ জ্বলছে।
যমরাত্রির নাট্যকথা। জন্ম করি, জন্ম ধরি।

বর্ণপ্রবাহ

বন্ধুর মতো, ঝুমকোজবা ;
একটি স্মরণীয় গান।
বলির আগে সিঁদুর উঠেছে আকাশে।
বলি দেবার পর
জল, দেবতার জল। গর্ভে গোসাপের
চিঠির ফণা। ফোঁপায় খড়কুটো।
আমাদের দেবতা হাঁস চুরি করবার পর
আমাদের ঘরে এখন মাংস খায় ; আর
একটি হাঁসের বর্ণনা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ঝুমকোজবার পায়ে

সংযম পাল

বাবার কবিতা

১

আলতো ক'রে তোমার মাথা তুলে
সরিয়ে নিই মরুপাথর, বালু
দু'হাত দিয়ে তোমার মাথা ধ'রে
সাজিয়ে দিই পুঁই-বেগুন ক্ষেত
তোমার গালে পোড়ার দাগ যতো
সেখানে আমি বুলিয়ে দিই জল
তোমার চুলে সকল রং কালো
ফিরিয়ে নিজে বর্ণ আনি শ্বেত

দিক্-বিদিক্ হরেক কোণ থেকে
ফেরারী যতো ভয়ের দৈত্যের
আক্রমণ ফেরাতে গিয়ে আমি
নিজেও যদি রুগ্ন হ'য়ে পড়ি
তবুও সেই হাসপাতাল থেকে
বরাদ্দ সব আপেল, লেবু, ডিম
তোমার হাতে গোপনে গুঁজে দিয়ে
দু'চোখ দিয়ে মহাভারত পড়ি

২

কোথায় কার বাড়ির চারপাশে
গন্ডি দিয়ে সবমধুর হাওয়া
আট্‌কে ছিলো ধর্মরূপী এক
ভণ্ড, আমি সেসব জেনে আজ
কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি, তুলে
গণ্ডী, আজ তোমার বিশ্বকে
ছড়িয়ে দিই এপার-ওপার মাঠে
ছড়িয়ে দিই ইশ কুলে, কলেজে

তুমিও ঠিক এমন ক'রে পরে
রক্তনীজ সাবাড় ক'রে যারা
আসছে, নীল মেঘরাতুল হাওয়া
মাখিয়ে দিও তাদের চুলে, ঠোঁটে
মাখিয়ে দিয়ে তাদের কারো মেয়ে
আদর ক'রে ছোট্ট ঘরে এনে
ভালোবাসার প্রতি-প্রতিষ্ঠানের
সরল শিশু উৎপাদন ক'রো

৩

কাকে সে তোমার জন্য পথে পথে অক্ষত আকাশ
ভেঙে ভেঙে তুলে দিচ্ছে, কাকে সে সোনালী চামচে
গুলে দিচ্ছে মধুমেশা কমুটে সাবান

তুমি চাও সত্যিসত্যি, নাকি সে অন্যায়ভাবে তোমার বাহানা দেখিয়ে
বরমাকে ফেলে দিচ্ছে অলস্ত আগুনে, আর
মানুষের মুখে মুখে তুলে দিচ্ছে কাদা

রাহুল পুরকায়স্থ

তাঁত

আমিও ত জানি তোর ঘর জুড়ে ছেঁড়া-ফাটা জুতোর কাহিনী
এই শীত চলে গেলে পড়ে থাকে শুকনো বাদাম
কলের বাঁশীর সাথে ঝলমল করে উঠি কবিনির্ভর
এই শীত চলে গেলে চিঠি লিখি তোকেই আবার

পুরনো পুরনো গ্রাম আলপথ ধরে
উড়ে যায় ভোরবেলা বাদামের খোসা
আহাগো আহাগো ভোর এখন সুমতি
দিলে যদি দাও তবে প্রথম লোকাল

বাস থেকে পাউরুটি শান্ত মিশনারী
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিলে তবে এই ইস্কুলে
ঈশ্বর দেখেছি আমি আজ দলে দলে
পরনে ইজের ছেঁড়া লিকলিকে পা
হাতে হাতে পাউরুটি অক্ষর জ্ঞান
ঈশ্বর দেখেছি আমি আপাদমস্তক
জরিপ করেছি আমি শুদ্র ইতিহাসে
টুকে নিই মাপজোক মুখের ফোকর
কতটুকু বড় ছিল কতখানি আলো
ছড়িয়ে পড়লে তবে এই ভোরবেলা
আমিও জেনেছি সব আমরা জেনেছি

এই শীত চলে গেলে চিঠি লিখি তোকেই আবার
পুনরায় ভোর এলে এইমত ভোর
আমরা আবার যাবো পুরনো সে গ্রামে
যেখানে আমার ভাই সাম্প্রদায়িক

ঢেউ

ছড়িয়েছি পথে পথে কৃমি সমাচার
আমিও দেখেছি তাই সবাকার মতো
সমুদ্রের যত জল
উড়িয়ে দিয়েছে ফেনা এই সংসারে
জ্বলছি জ্বলছি আমি জ্বলে গেছি তারকার ঢেউ
জ্বলে যাই চেয়ে দেখি এই কুয়াশায়
চিঠির ডানায় মেঘ
বর্ষা হবে কথা হবে কুসুম কাননে

অতএব ঘোলা জলে তারপর ডুব দিই
বাঙালীর ছেলে

ডুব দিই ডুবে যাই
ডুবে ডুবে জল খেয়ে ভেসে উঠি পুনঃ
জগৎপুরের কথা মনে পড়ে মনে পড়ে খুব
আমারো ত ছুটি ছিল দীর্ঘ অধসরে
ফসলের গান ছিল আমাদের ঘরে.....

আমি কি ডুবছি ফের নষ্টালজিয়ায়
ক্ষমা কর ভাই সব ক্ষমা কর তবে

সমুদ্র জাগল যেই এই সংসারে
ভেসে গেল এ্যালবাম হারমনিয়ম
কথা হ'ল আনবিক গূঢ় সংকেতে—
(জলরেখা থেকে এলে ন্যাংটো ছেলেরা
লাল নীল জামা দেব মাথায় পালক
বিশ্বব্যাংক আছে আর আছে বড়মামা
আস্থা রাখ বাল্যসখা ভাঙা দর্পণে)

সকাল হয়েছে যেই ছিঁড়ে গেল আমাদের ঘর
'তবে ভালো রাত ভালো' এই কথা বলে
উড়ে গেল পরীদের আলাভোলা ছেলে
উড়ে গেল পাহাড়ের গোপন গুহায়
ঘুম নেই সেই থেকে পাড়া-পড়শীর

আমি ত ভালোই আছি
যতটুকু ভালো থাকা গেলে যাওয়া যায় তোমাদের কাছে

বর্ষা

যেতে হবে, একদিন সবাই যাবো
বাংলার জয়োৎসবে

আপাতত কথা ওড়ে হাসপাতালে
কথা শোনে হলুদ সকাল

ভাষাবোধ ছুঁয়ে যাবে ছন্দপ্রবণতা
মাটির শরীর জুড়ে সবুজ উৎসব

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রি

তারপর দুপাশে খই ছড়িয়ে
মৃত কাঁধে চলে গেল লোকজন

একটি অন্ধ ছেলে দাঁড়িয়ে রইল বাকি রাত্তির
বারান্দায়, রেলিঙ ছুঁয়ে

পিছনে কাঁচের শার্সিতে ঠিকরে পড়ছে জ্যোৎস্না

কান্না

ঠিক যে কেন না জেনেও একদিন
চাঁদ নেমে আসে জানলার কাছে

টেনিতে পুড়ছে তেল
চোখ তুলে এদিকে তাকাও, দ্যাখো
চৌকো কাগজ ছাড়া
কবিদের আর কোথাও গিয়ে কাঁদবার জায়গা নেই

মৃণাল সেন

চালা ফুঁটো করে দিয়ে বৃষ্টি নামল সেই রাত্তিরেই

আমরা কজন ছাতা মাথায়
ঘেঁষঘেঁষ করে বসে আছি ঘরের ভেতর

বাইরে ভোর হচ্ছে
আর জলের ধারায় মুছে যাচ্ছে
শ্লেট পেন্সিলে আঁকা আমাদের যোগ–বিয়োগ চিহ্নগুলি

মৃত্যু

ঘুমের মধ্যেই মারা গেছে যে মানুষ
সে মৃত্যুকে চিনে নিতে পারেনি

শব্দ

বধিরদের বিদ্যানিকেতনে কোনো ঘন্টিওলা থাকেনা

টিফিনটাইমের রোদ্দুর এসে
অল্প অল্প আঙুল রেখে যায় তাদের ক্লাসঘরে

দূর থেকে বোঝার চেষ্টা করি
এক একটা শব্দ কেমন করে শব্দহীন ভাবে হারিয়ে যাচ্ছে

নৈঃশব্দ্য

অথচ আমার এই নৈঃশব্দ্যও নিরক্ষর নয়

মুঠোভর্তি শূন্য কাগজকুচি
সব ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে আজ যাওয়া

এই আমি হেঁটে যাই তার পাশ দিয়ে

লক্ষ্য করো
শব্দের পেরেকে বেঁধে পা

সব্যসাচী দেব

ভারতবর্ষ

অন্ধকার আছড়ে পড়ে গলুই-এ
ঢেউ-এর আড়ালে দিগন্ত হারিয়ে যায়,
মাছধরা জালের মধ্যে
লাফিয়ে ওঠে
রাত্রির হিম ;

বালিয়াড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
ঝড়ে-উড়ে-আসা চাল,
কুপি নিবিয়ে
তুমি এসে দাঁড়াও
বেলাভূমিতে—

মৃত মাছের ঝাঁকের সঙ্গে
সমুদ্র ফিরিয়ে দেয়
জেলে নৌকার ভাঙা টুকরো ;

শান্ত ভোরে বালি ওড়ে হাওয়ায়.....

অমিতাভ গুপ্ত

পুরাণকথা / ১. রত্নলাভ

অমোঘ কোন্ মৈত্রেয়'র শেষ স্তোত্রপাঠে
ছড়িয়ে দেওয়া, এই রত্ন। তাঁর আয়ুর মতো
ঝলসে উঠছে গর্ভদ্যুতি
পৌরুষ যখন শুচি
হল, যখন প্রস্তুত হয়ে উঠল তাঁর স্তব্ধ
জাগত শোকগাথার মতো নারীকুহর
আজ পড়ে আছে মণি
মৈত্রেয়কে সাজিয়ে দিয়েও তার রূপ ফুরাবে না

২. রত্নমোচন

যা ভেবেছিলাম, মৈত্রেয়, আজ তা-ই হল

পানশালার রাত্রির মতো অস্বচ্ছ হয়ে আসছে স্মৃতি। তবু
মনে পড়ে, যে-রত্ন এনেছিলাম, রক্তিম, যেন কোন্
প্রতিজ্ঞার মতো— কীভাবে তা পথচ্যুত হল

অন্য জনপদবধূ কুড়িয়ে পেয়েছিল, পরেছে কর্ণভূষণে
আজ প্রকাশ্য জ্যোৎস্নায় তার ফাঁসি তার ফাঁসি

সাম্রাজ্যযুগের বাসনা ঝলসে উঠছে পাথরের প্রাচীরে। অস্পষ্ট
গুঞ্জনের মতো কথা বলছে একজন : যে প্রেমিক যে হন্তারক

অজয় নাগ

এই ছদ্মবেশ

তোমার চিঠির অক্ষরে আশ্চর্য বিষম স্বাদ পেলাম···

স্থির দৃষ্টিকোণে কুয়াশার ঘ্রাণ
বিকালের প্রাজ্ঞ আলোকে অপরাধী আকাশ দাঁড়িয়ে ..
গোপন হিংস্র দাঁতের ফাঁকে মরা চাঁদের জরায়ু...
দেখলাম মানুষ মানুষের কাছে কত নগণ্য কত অসহায়

বেরিয়ে পড়ে তিক্ততার নির্যাস ভয়ঙ্কর লোভ—ভিতর থেকে স্পষ্ট...

মুখের শব্দ সময়ের আঘাতে কতটা নামিয়ে এনেছে
সেই দৃশ্য কি কখনো দর্পণে পেয়েছ—
কঠিন তীক্ষ্ণ ছেদক মলিন আরাধনা...

এই ছদ্মবেশ নিজেকে নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার ?

রাস্তা খুঁজছ ... পোড়ামুখ ঢাকছ ... ...
আমার দেখার ইচ্ছে নেই শেষ পর্যন্ত কী হয়

তুমি তোমার মিথ্যের কাছে আজীবন নতজানু থাকো—
এই তোমার সান্ত্বনা—এই তোমার শাস্তি

পুঁথি

তুমি পুঁথির অক্ষর বড় বিশ্বাস করতে
তোমার চোখ আলো হারিয়েছে

তুমি ভুল মাটিতে প্রতিমা গড়েছ
প্রতিমা তোমার আকাশ ঢেকেছে

পুঁথি তোমার বড় প্রিয় ছিল
পুঁথি তোমার একমাত্র ছিল
তুমি কখনো মানুষের মুখ দেখনি

তোমাকে পোড়াবো পুঁথির পাতা পুড়িয়ে

অরুণ সাধুখাঁ

হাত পেতেছি অন্নপুর্ণা

যতক্ষণ রাত ছিল ঝুলে ছিলাম, কুড়ি বছর ব্রীজের বয়স
দিনের গায়ে জব্দ কুয়াশা মিশে গিয়েছে
সন্ন্যাসী ফিরে আসি রাত কাটাতে
শুন্য কলসী ভরেছে হাসিতে।

হাত পেতেছি অন্নপুর্ণা, ভিক্ষা দাও, মাস চলে না।

খুলে দাও জানলা মশারি, আলো আসুক ভিতর থেকে।
ভাতের কাঁকর ছড়িয়ে আছে তৃণভূমিতে
সেই ছেলেটা আখের খেতে হারিয়ে গেছে।

নোংরা জামা ছেঁড়া প্যান্ট লাইন দিয়েছে,
চলন্ত সিঁড়ি ছুটছে কেরোসিনের দোকানে
আলুর চপ তাকিয়ে আছে সুন্দরীর ঠোঁটের দিকে, বুকের দিকে।

বাদামি যুবা জাম খেয়েছে চুরি করে পড়ার ঘরে,
আকাশ থেকে নেমে এলো দেবদূতের বাচ্চা,
গাধার পিঠে পরাণ ঠাকুর গান গাইছে নির্বাসনে।

হাত পেতেছি অন্নপুর্ণা, ভিক্ষা দাও, মাস চলে না।

প্রবীর রায়

নিবেদন

কপালে ভস্মটিপ তুমি বুঝি ধরিত্রীর মেয়ে
তাই এত লালমুখ ঠোঁট কেঁপে আসে
দুটাকার ফুল কিনে কাকে দেবে
সেকি তোমার দেবতা কোনও শরীরী ভ্রমণে

ভস্মবিন্দু ভাল আরও ভাল ফুলের পিপাসা
ট্রামলাইন ধরে তুমি হেঁটে যাও হলুদ বাড়ীতে

ফুল নয় তুমি জান হোমকুণ্ড আগুন প্রত্যাশী।

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নে মিছে বৃষ্টি দেখে

কেমন শোকে সব পারাপার মিথ্যে করে দিলে ?
মেঘের মোহে বৃষ্টি রেখে রাতুল মায়ামৃগ
স্বপ্নে পুড়ে খাক, পিছুডাক মিছেই ডেকেছিলে
অগ্নিবাসর জাগিয়ে ঘুমে ভিজিয়ে রাখি জীবন

অনুশাসন পর্বে আলো চুঁইয়ে নামে লতায়
খিদের রঙে জ্যোৎস্না মেখে শহর প্রেতায়িত
জানো, আমি রত্নাকরের অন্ধকারের কথা
বলতে গিয়ে দেখতে পেলাম, বন্ধুরা সব মৃত

দেখতে পেলাম লব কুশেরা কান্না অভিনয়ে
মিথ্যে করে প্রজাপালন গল্প ত্যাগব্রত
অনজিত দিগ্বিজয়ের অপাপবিদ্ধ ভয়ে..
চোর সাজালো, ব্রহ্মচর্যে বালক ছিল যত

আমিও তো ভাই আলাদা নই, ভালোই বাসি খেতে
চিকেন পাকোড়ার অনুপান আঙুর আপেল সুরা

সম্পদে রোদ্দুরের স্নানে হঠাৎ রাতবিরেতে
পরকলা কৌতুকে পাগল সংসারী বন্ধুরা

লিট্‌ল ম্যাগাজিন দেওয়ালীর শিলীন্ধ্র তাণ্ডবে
যশের হাউই তারায় জ্বলে স্বপ্নকুসুম মালা
অরূপ ভালোবাসার আজব গপ্প বলে কবে
হাসির ভাণে ঢাকতে শিখি কান্না চাপার জ্বালা

জ্বলছে চিতা, একশো চিতা, হাজার, নিযুত, কোটি
রক্তকাদায় হোঁচট খেতেই হাসছিল বন্ধুরা
আন ভিডিও ক্যাসেট, না থাক কাপড়া, মকান, রোটি
আঁশটে কথার কুরুক্ষেত্রে পাক পাড়ে জন্তুরা

সবুজ গন্ধে বৃষ্টি খুঁজে একটি মায়ামৃগ
দেখল, খাঁচা সোনার ডানার শ্রান্তি মোহে নীলে
খেলার ছুতোয় বানিয়ে রেখে লক্ষ জতুগৃহ
কোন সাহসে, 'সব কবিতা, মিথ্যে' বলেছিলে ?

বারান্দায় পুতুলের দেশ

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দরজা আর বন্ধ করি কত ? খুলে যায় ধু ধু জ্যোৎস্না হাওয়ার আগল
বারান্দায় শত শত খোকাখুকু, কিশোর কিশোরী, কত পুতুলের মেলা
তোমরা কি দেখতে পাও নি ?
আমি এই চণ্ডাশোক অন্ধকারে রত্নাকর দস্যু সেজে পথে দাঁড়িয়েছি
সুজলা সুফলা ভূমি একটু ভাত চাইলে পর বলে ওঠে, পিশাচ, পিশাচ...
ক্ষুধার খাণ্ডব শীতে পুড়ে যায় উপবন, জনয়িত্রী, তোমার কঙ্কাল
কুয়াশার নদী থেকে খুঁজে এনে বেচে দিই মন্দিরের পাশের গলিতে
আস্তস্তা সেজেছে বাসি রক্ত ঠোঁটে নখে মেখে, একবেণী হাড়ের মালায়
তোমরা কি কখনো ছাখো নি ? দরজা বন্ধ করব কীভাবে
অন্ধকার বারান্দায় প্রেতায়িত খোকাখুকু, কিশোর কিশোরী

পুতুল, পুতুল, কত জ্যোৎস্না চুঁইয়ে নামে কুয়াশার দুধেল নদীতে
বালির তিনটি সেতু স্বর্গ মর্ত্য পাতালের ত্রিবেণী মায়ায়
আমাকেও ডেকেছিল, আমার থাকার কোনো বাড়ি নেই বলে
আশরীর আলোর শহরে শুধু জ্বলে নেভে পুতুলের রঙিন দোকান—
প্রেক্ষাগৃহে যখন তখন ঢুকে স্মৃতিহীন স্বপ্ন দেখা এমনই সহজ !
বন্ধু কেউ এখানে আসেনি তাই মা বাবা ও ভাইকে ডেকেছি
ভাই কি দেখতে পেল অভিশপ্ত জ্যোৎস্নায় অনাঙ্গিক পুতুলের মেলা ?

এদিকে যখন বন্ধ, খুলে যায় ওদিকের দরজাগুলি, প্রেতের নিঃশ্বাস
জ্যোৎস্না বাতাসে ভেসে করাঘাতে ডেকে যায় ত্রিবেণী মায়ায়
তোমরা ছাখোনি এই পুতুলের দেশ ?

দিলীপ ভট্টাচার্য্য

তখন শুধু

ট্রেন নেই, প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা
শুধু হৃদয়ের শব্দে জেগে আছে ষ্টেশন।

চিনে বাদামের খোলা, পোড়া সিগারেট
ভুলে ফেলে যাওয়া রুমাল হাওয়ায় উড়ছে—
কে তুমি একা জ্যোৎস্না মাপছো ?

ঘুমের ঘোরে ছাখো
পরীদের সাথে তুমিও চলে যাও আকাশে—
তারাদের গায়ে ভালোবেসে রাখো হাত

তখন শুধু খালে বিলে পড়ে থাকে একা চাঁদ।

বিশ্বনাথ গরাই

টান

পরিয়েছি তাকে সুস্তের ঋজু ফাঁস—
এবার তবে কি বাজবে দেমাকী শিকল।
মুখ তুলে এই শান্ত রূপকে ওরা
বিস্ময়ে ছাখে দূরে দূরে ফুটে আছে
জমির ভিতের ওপরে সবুজ তারা—
চট করে যদি পূর্ণ হাপিশ করি
এইসব ছোট অলংকারের সুখ—
ছুয়ো দিয়ে দ্রুত আলগোছে সরে যাবে
লতানে রোদের আড়ালে সরব গাছ
কোথায় লুকাবো স্মৃতিময় এত শ্বাস ?

রাখালের মতো উন্মন সুখে ফিরি
মাঠ থেকে বাটে, মাটি খেয়ে বাড় বাড়ি—
নাক-উঁচু যত হাওয়ার অলক্ষুণে
তাড়সে ছিটোই বুকের পাটায় থুতু—
প্রথাগত নই, এই আক্ষেপ হেতু
গুরুজনেরাও সমানে ছুচ্ছি করে !

থিতু নই আমি, পৃথিবীর এই খোলা
বাকুলে ঘুরবো সকলের সন্তান—
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত আর যত ঋতু
সম্ভোগ করি, প্রাণে এত সংরাগ
আমার ভিখারী নোলায় পাল্লা দেবে
সূর্যের মতো আছে কেউ রাশভারী ?

বেঁধেছি তোমাকে, আমি আজ শুধু ডানা—
বাতাসের ছুরি রক্ত ঝরাবে তবু
চাপাস্বরে ভিজে একদম মরবো না !

নাসের হোসেন

কবিতার শরীর

নিচে খুব নিচে
পরিখার পাশ দিয়ে
সন্তর্পণে হেঁটে আসছে কারা ?
আমার সম্মুখে, আমার পেছনে
চতুর্দিকে
অন্ধকারের পাহারা !

অন্ধকার টক্কর খায়
দেওয়ালে— পুরনো স্বাস্থ
কাচের মতো —কিংবা
কোন তৈলচিত্র
ঘরে রঙিন বুনোটের মধ্য থেকে
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে নারী এবং
ধারালো হাতিয়ার
আর মানুষের মরণপণ যুদ্ধ !

আমি আমার কবিতার কাছে
ফিরে যাবো—এ এক বিশুদ্ধ অঙ্গীকার
চারপাশে অন্ধকার
অন্ধকারের জল অন্ধকারের স্থল
পরিখার পাশ দিয়ে
সন্তর্পণে হেঁটে আসছে কারা ?
নেই সাড়া !

জয়তী রায়

বৃক্ষ তা জানেনা

আলোর অধিক আলো,
বোধের অতীত কোন বোধ
অন্তরালে ছিল,
শিরের অধিক কিছু ছিল কিনা
জানেনা তা গাছ ও পাথর :
জরায়ুতে ভ্রূণ শিশু
নাড়ীতে গভীর টান,
নদীও কি প্রজনন জানে ?
মাছের শীতল চোখে
জেগে ওঠে গভীর উল্লাস—
নদীও কি মায়ের মতন
বুকের শিশুর কাছে
খুব তীক্ষ্ণ ধারাপাত রেখে যেতে চায়
অথবা শেখাতে পারে রক্তের বানান ?
বৃক্ষ তা জানেনা :
সূর্যেরও জন্মকাল জেনেছে কি
বৃক্ষের শিকড় ?

সুজন পাল

যদি চাঁদ না ওঠে

তখন যদি চাঁদ না ওঠে, ...
যদি না বৃষ্টি হয়...
শঙ্কিত তোমার চোখ, তোমার কণ্ঠস্বর—
যদি চাঁদ না ওঠে !
তবু জেনো কাঁপা ঠোঁট ছুঁয়ে যাবে পা,
ঠোঁট, নখ, চুল – তোমার হাত,...

তুমি ছুঁয়ে থেকো নাভি,
দায়বদ্ধ থেকো এইসব রাত আর
বনতুলসীর কাছে।
সেদিন চাঁদহীন চন্দ্রাহত অন্ধকার রাতে,
বৃষ্টিহীন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রাতে –
"মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি।"

চন্দ্রাণী দাশ

প্রবাহ

একটি ঘাটের পথ, একটি আঘাটা।
কোন্‌দিকে যাবো ভেবে ভেবে
প্রতিদিন মাঝখানে শরীর গেঁথেছি।
আমার এপাশে এক ঘোড়া-নিম
ওই পাশে অঢেল গোলাপ,
গোলাপের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে
পা চলতে চলতে ঘোড়া-নিমের তলা
এবং অনেক নীচে, আরো নীচে
গঙ্গার কল্লোল।
তার জল
মানুষের পাপ–পুণ্য বোধ ধুয়ে দেয়
মৃত্যুবোধ ধুয়ে দেয়
মানুষ ফলায় যেই জনস্রোত
তার স্রোতে মিশে যেতে যেতে
আমিও সে জল-টান কেবলি শুনেছি
অথচ নাবিক নই, যাযাবর হবোনা কখনো,
তবু জলস্রোত দেখে, একটি প্রবাহ এঁকে
জনস্রোতে মিশে যাই যেন।

শৈলেন্দ্র হালদার

দেশী কড়চা

আমিও তো এক মানুষ ছিলাম
রক্তে এবং মাংসে গড়া
তার ভেতরে জ্বলত বিবেক
আজকে আমি অন্ধ-জরা

হাতের রেখায় বজ্রচমক
যা ছুটেছি প্রদক্ষিণে
বাঁধছ মগজ রঙিন জামায়
পা বেঁধেছ শিকল ঋণে

রেডিয়ামে জ্বলত দুচোখ
চুল উড়েছে তুফান ঝড়ে
নখ করেছ নেকড়ে থাবা
গর্ত কেবল খুঁজেই মরে

ঠোঁটের খাঁজে রক্তকাদা
বিক্ষত আজ তাজা বুকে
ভীষণ শব্দে ছুটছে রোলার
ফুসফুসেতে পড়ছে চুকে

রোজ দুবেলা খাচ্ছি ডিঙ্গেল
আগুন বেরোয় মুখ থেকে তাই
জিহ্বা আমার যাচ্ছে পুড়ে
পুলিশ ভ্যানে মুখ ঢেকে যাই

আমিও তো মানুষ ছিলাম
রক্তে এবং মাংসে গড়া
এদেশ ভাসে চোখের জলে
নয়ত ক্ষুধায় জ্বলেই খরা

চন্দ্রাণী দাশ

কোথায় পাবো মেলা

শীত এসে গেলো।
কাঁথা-পত্তর রোদে শুকিয়ে
সোয়েটার চাপিয়ে
পাতে ফুলকপির ওম—
জীবনটা রোদের ভাপে কচি ধনেপাতার মতন
তাতানোর পালা।
অনেকে বেড়াতে যায়,
পুরী, দীঘা, নেতারহাটের বাস ছাড়ে।
আমি কোথাও যাই না,
শুধু মনে মনে মেলা খুঁজি,
শীতের দুপুর-রোদে তপ্ত মেলা—
একাকী মেলায় হাঁটি
ধুলো ওড়ে,
ওরা ঘোরে
হাজার হাজার জন—
মেলায় অনেক স্বর একটিই সুর হয়ে যায়
কাঁচের চুড়ির মতো কিছু বাজে,
সস্তায় বেগুনী বিকায়

একদিন পাবো তারে মেলাতেই নাগর বিকেলে।
মনে মনে রোজ হাঁটি,
বাউলের গান শুনি, খুঁজি
কোথায় কেঁদুলে।

মলয় দে

একলব্য

যখনই দিয়েছ কোনো অযাচিত রকমারি ভাষা
দেবে বলে কিছু কিছু প্রাকৃত প্রহর—
দেখেছি তোমার ওমুখে চেয়ে থাকে
কোনো এক রাতের শহর।

বোহেমিয় লোরেটো ফোয়ারা।

আবক্ষ মূর্তির দিকে চেয়ে ছাখো—
কোনো এক পাগলাটে সামান্য হেসেছে গলা ছেড়ে।
মেলেছে ওদের কাছে দিন আর রাত—
অচ্যুত যতকিছু আশা ; হয়েছিল যারা—
আহত শ্বাপদ, কবলিত দুষ্কৃতকারী।
শহরে যখনই জাগে ধরাশায়ী কুতুবমিনার
ফোয়ারার পাশে পড়ে থাকি, গগনবিহারী।

কবিতার ইস্কুল

—সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

'Love is like the measles, we all have to go through it'—রসিক মেজাজে প্রেম সম্পর্কে এমন কথাই তো বলছিলেন জেরম কে জেরম তাঁর এক স্বভাবসিদ্ধ রচনায়। কে অস্বীকার করবে তাঁর এই আপাতলঘু সারিক বক্তব্য? আর এদিকে এক প্রাচীন প্রবাদ আছে, বাঙালি নাকি সারাজীবনে দুটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই থাকে—এক, হাম, দুই, কবিতাচর্চা। কোনো না কোনো বয়েসে প্রথম রোগটির কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণ করতে হয়নি, এমন বাঙালি বিরল ; আরো বিরল সম্ভবত তেমন বাঙালি, প্রেরণাবশে, ঝোঁকের মাথায়, অন্তত প্রেমতাড়িত হয়েও দু-চার স্তবক কবিতায় নিজেকে সঁপে দেয়নি। অলস মস্তিষ্কে শয়তান বাসা বাঁধে, কথাটা ঠিক ; মাঝে মাঝে কবিও কি ঘর বাঁধে না? সবসময় সে যে গ্রন্থস্থ হয়ে নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদেই কবিতার কাছে নতজানু হতে চেয়েছে, তা তো নয় ; এমনও তো দেখি প্রচার-বিমুখ মানসিকতা থেকে উঠে এসেছে তাঁর সারা জীবনের কম-বেশি উচ্চারণ, ছন্দের কাঠামোয়, কবিতার শিল্পিত স্বভাবে। পরবর্তী জীবনে আকস্মিক আবিষ্কৃত হয়ে কেউ সংকোচে কুঁকড়ে থাকেন, কেউ হন অহংকারী, কৃতিত্বের দাবিদার।

এসব কথায় আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে 'কবিতার ইস্কুল'? নিবন্ধের শিরোনামে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ চমকে উঠেছেন, জানি। ১৯৩৮-এ লেখা কবিতাপুরুষ বুদ্ধদেব বসুর 'লেখার ইস্কুল' মনে পড়ে? সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানির পাশেই কিছু প্রত্যক্ষ প্রস্তাব, সেই অসাধারণ সাহিত্যমনস্কতা, গভীর প্রত্যক্ষণ? এই কিছুদিন আগেও হাতে একটা বিদেশী বই পেয়ে আবার চমকে গেছি, 'দি আর্ট অফ্ রাইটিং'। এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ওপর কিছু কিছু নির্দেশ দেওয়া আছে, আছে সৃষ্টিশীল রচনার জন্যও। কেমন করে লিখতে হয় ছোটগল্প, উপন্যাসের আদর্শ গঠন কেমন হবে, কিংবা নাটকের চরিত্র গড়ে তোলা যাবে কোন্ পথে, ইত্যাকার হাজারটা বিষয়। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। ওরা সাহিত্যের এক একটা গোত্র সম্পর্কে কাউকে প্রাণিত করার জন্য কতটা আগ্রহী, বিশ্লেষণমুখী, গঠনধর্মী। এইবার চমকে উঠলাম, বইটাতে কবিতার মত একটা স্পর্শকাতর শাখা সম্পর্কেও একটা অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। সেখানে চর্চিত বিষয়গুলো এরকম :—Poetic Spontaneity, The Poetic Experience, Why Poetry Goes Beyond Verse, Rhythm, The Poetic Incantation, Language That Transcends Itself, What a Poem Can Convey, Richness and Strangeness,

আর সবার শেষে Self-training, আত্ম-অনুশীলন। এইসব আলোচনার সূত্রে ওরা কি করতে চায়? ওরা কি নিউ ক্যাসেলে আরো কিছু কয়লা আমদানিতে বিশ্বাসী?—আরো এক ঝাঁক কবির উৎপন্নে? এভাবে কি কবিতার কোনো 'ট্রেনিং' সম্ভব? আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বোধহয় একটা অধ্যায়ও ছিল সেই বইতে, এবং কবিতার ওপর সেটাই ছিল প্রথমতম শিরোনাম, 'Attempting the Impossible', অসম্ভবের জন্য প্রয়াস। এবং তার উদ্বোধনী অংশে ছিল দুটি সত্যের উদ্ভাস :'No advice can make you a poet if you aren't. Here the myth of the Muse rings truest.' আমাদের জীবনানন্দীয় ঘরানার সেই বহুলশ্রুত আপ্তবাক্য : 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' বাঙালি বলেই সকলেরই কবি হয়ে যাওয়াটা তাই অভিপ্রেত নয়, কেউ কেউ সাম্রাজ্য করুক স্বপ্রেরণায়, বিরল যোগ্যতায়, দৈব দক্ষতায়। এখানে কোনো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা ঠুনকো মান-অভিমানের প্রশ্ন জড়িয়ে নেই। আছে কি? বরং মানতেই হবে, কাল এ-সবের শ্রেষ্ঠ বিচারক। সে-ই নির্ণয় করে নেবে, কে মাটি কামড়ে থেকে যাবে, আর কেই-বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সময়প্রবাহে।

২

আমি এখানেই একটু ভাবতে বসি। বুদ্ধদেব বসুর প্রাগুক্ত প্রবন্ধের একটা জায়গায় চোখ আটকে যায় : 'আমি এক-এক সময় ভাবি, লেখার একটা ইস্কুল খুললে কেমন হয়। বিজ্ঞাপনে দেখেছি, বিলেতে অনেক ইস্কুল আছে যারা পত্রযোগে গল্প লিখতে শেখায়। তাদের শিক্ষার প্রণালী প্রত্যক্ষ জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু অনুমান করি যে বিলেতি সচিত্র মাসিকে যে-একধরনের ছক-কাটা মাপসই গল্প ছাপানো হয়, সে-গল্প এদের সাহায্যে লিখতে শেখা অসম্ভব নয়। অন্তত ভাষাব্যবহারের দু-একটি বাঁধা-ধরা কৌশল, এবং নির্ভুল বানান ও ব্যাকরণ তো শেখা যায়।' এখানেই কথা। যা ছোটগল্প, উপন্যাস বা নাটকের জন্য ভাবা যায়, তাই কি ভাবা যাবে কবিতার জন্য, যেখানে শুধুই আত্মকথন, নৈঃশব্দ্যের চর্চা, সংবেদনী ভাষাশিল্পের প্রয়োগকারু, ব্যক্তিগত ভাবনা ছাপিয়ে সার্বিক হৃৎস্পন্দন? কোনো ছকে-বাঁধা যান্ত্রিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে কি এই ভাবে কবিতার প্রাণকে ধরে ফেলা যাবে, সম্ভব? উত্তর নিষ্প্রয়োজন, অবশ্যই নয়।

তবু আমি 'কবিতার ইস্কুল' স্থাপনার কথা ভাবছি কেন? সেভাবে কি বড় জাতের কবি তৈরী করা যাবে, সেভাবে কি পাঠক্রম বেঁধে প্রথাগত কবিতার নির্মাণরহস্য বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কাউকে? একটা ভালো কবিতা লেখা হয়ে গেলে তার আবৃত্তি সম্ভাবনা নিয়ে ক্লাস খোলা যায়, কিন্তু সেই ভালো কবিতা লেখার ব্যাপারটা কি হাতে-

কলমে শিক্ষণীয় কিছু? সে কথায় পরে আসছি। আগে একটু সেরে নেওয়া যাক, কবিতার ব্যাপারে ইস্কুল খুলে কি শিক্ষা দেয়া যায় না, সেই প্রসঙ্গে। ক্রমিক উত্তরণের পথ বেয়ে কোনো কবি নিছক শব্দলীলা ও কাব্যিয়ানা ছেড়ে কিভাবে বোধের জগতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন, একি কোনো প্রতিষ্ঠান খুলে মাথায় ঢোকানো যাবে কোনো উদীয়মান কবির? এতেও সেই কবির বোধোদয়ের দাবিই আছে। 'জ্যোৎস্নাময়ী নিশি তব, জীবনের অমানিশা ঘোর/ চক্ষে তব জাগেনি কিশোর!/আঁধারের নিবিকল্প রূপ/স্পন্দহীন বেদনার কূপ/রুদ্ধ তব বুকে', 'ঝরা পালক'-এর এই অ-জীবনানন্দসুলভ শব্দঝংকারের পর কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁকে পৌঁছতে হয়েছে কিভাবে সেই অতলান্ত পরিণতির পৃথিবীতে, ছুঁতে হয়েছে অনুভবের জগত—'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,/ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে ছাখে তারা :/যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া' ('অদ্ভুত আঁধার আজ'), —একি হাতুড়ি পিটিয়ে আলোচনার কচ্‌কচিতে বোধগম্য হবে কোনোদিন ক্লাস নিয়ে? কক্ষনো না, আর হলেও, কতটুকুই বা? এটা সম্ভব ক্রমাগত পাঠের মাধ্যমে, নিভৃত চর্চার ধারাবাহিকতায়, আর তার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হয়ে অপরের কাছে হাত পাতার মূল্য কতটুকু? তবে হ্যাঁ, অ্যাকাডেমিক মতবিনিময়ের সূত্রেও তো কিছু আলো ঠিকরে পড়ে, সন্দেহ কি? যেমন, 'সকলের মাঝখানে বসে/আমারি নিজের মুদ্রাদোষে/আমি শুধু হতেছি আলাদা',—জীবনানন্দের এই 'সেলফ-এ্যালিয়েনেশন' কি একটা-আকাশ-থেকে-পড়া বিচ্ছিন্নতাবোধ, একাকিত্বের চেতনা? একমাত্র অ্যাকাডেমিক আলোচনাতেই হয়ত এটা দেখানো সম্ভব, —প্রতিতুলনায়- এর পুরনো বীজ নিহিত ছিল, আশ্চর্যের হলেও, ওই 'ঝরা পালক'-এই, 'নীলিমা' কবিতায়, ছোট্ট একটি ছত্রে, 'জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি।' এসব হল, কবি কি বলছেন, তাঁর বিষয়ভাবনাটা কি, কি তাঁর বলবার, জানাবার, শোনাবার?

৩

এর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে দ্বিতীয় একটি সত্য—কিভাবে বলছেন কবি, কোন্ ভঙ্গিমায় শোনাবার কিংবা কোন্ আঙ্গিকে জানাবার কথা ভেবেছেন তিনি? ছন্দের বারান্দা বেয়ে, না নিশ্ছন্দে, মিল সহযোগে, না নিমিল প্রয়াসে, কবিতা-কণিকায়, নাকি আয়তনবান দীর্ঘ অথবা গদ্য—কবিতায়? এ-সব হল কবিতার প্রাকরণিক দিক। এখানেই বোধহয় একটা শিক্ষাক্রমের সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যায়। বোধহয় কেন, নিশ্চিতই। তবে

ব্যতিক্রমী কেউ কেউ যে আছেন, এতে কোনো সংশয়ই নেই। অনেকেরই ছন্দজ্ঞান জন্মগত, কান সজাগ। তবু বলতে হয় এসব সহজাত ক্ষমতাও অনুশীলনে ধারালো হয়, তীব্রতর হয়। ভাবা যাক, কবিতার জন্য চিহ্নিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে হয়ত কবিতার ভাবনা-বিষয় সরবরাহ করা হচ্ছে না, কিন্তু ক্লাস নেওয়া হচ্ছে একটা নির্দেশিত এবং স্থিরীকৃত বিষয়কে কিভাবে আর কতভাবে, কত প্রাঞ্জলতায় কিংবা অলংকারে উপস্থাপিত করা যায়। কিভাবে ও কেন আর কোন্ অব্যর্থ অনুষঙ্গে এসে পড়তে পারে একটা অনিবার্য বাকপ্রতিমা। অথবা পরিমিতির কতটা অনুশাসনে ব্যঞ্জনায় আলাদা মাত্রা যোগ হবে। কোথায় তুলে নিতে হবে লেখনী, কোন্ কথার পর সংযমী হতে হবে কবিকে, কোথায় পেঁছিতে চায়, পেঁছে দিতে চায়, তার উচ্চারণ; একটা স্পর্শপ্রবণ স্বপ্নময় মুহূর্তে কখন কোনো কথারই আর প্রয়োজন পড়ে না, 'a sight to dream of, not to tell.'

আমার তরফে আলোচনার সুবিধার্থে, হাতের কাছে উপযোগী বাঙলা কবিতা অলভ্য হওয়ায়, একটা ইংরেজি কবিতার প্রসঙ্গ টানছি। বহুপঠিত এই কবিতাটি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লুসি–সিরিজের প্রথমতম নিবেদন 'স্ট্রেঞ্জ ফিট্‌স অফ প্যাসান'। অনুষঙ্গটি এইরকম: কবি এক প্রদোষ–লগ্নে প্রিয়তম লুসির কুটিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। তিনি অশ্বারোহী। সান্ধ্য চাঁদের দিকে সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন ক্রমশ। একটা স্বপ্নিল অভিসার প্রকৃতির প্রেক্ষিতে। একটা সময়ে কুটিরের খুব কাছাকাছি আসার পর অপ্রত্যাশিতভাবে চাঁদ যেন তাঁর দৃষ্টির অগোচরে খসে পড়ে, অন্তর্হিত হয়। অশুভ সংকেতের সংস্কারে ভীরু হয়ে ওঠে তাঁর মন: লুসি যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে এই পৃথিবী থেকে। পাঠকের মন কিন্তু উচ্চকিত হয়ে ওঠে—কবিতার শেষে কবি কি মিলিত হতে পারবেন তাঁর লুসির সঙ্গসুখে? এরপর কবিতার দুটি অন্তিম ছত্র:

'O mercy!' to myself I cried,
'If Lucy should be dead.'

ব্যাস্: কবি শেষমেষ কুটিরে পেঁছিতে পারেন কিনা, সে সংবাদ আর কবিতায় ধরা থাকে না, এ প্রচ্ছন্ন খবরটুকুও আর আমরা পাইনা লুসি সত্যিই বেঁচে ছিল কিনা কিংবা অন্যরকম কিছু। কবির পেঁছিসংবাদ না থাকলেও কবিতা কিন্তু পেঁছে যায় তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে, প্রার্থিত ঠিকানায়। জাতকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কলম তুলে নেন সঠিক

লগ্নে, অন্য কেউ হলে হয়ত যা করতেন না, আর সেই না-করার সূত্রে তিনি আহত করে চলে যেতেন ওই অনবদ্য কবিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটুকুকে। এবং এইখানেই একটা ভেদরেখা থেকে যেত বড়ো মানের কোনো কবির সঙ্গে তৃতীয় গোত্রের কোনো পদ্যকারের।

এটা কৌশলের ব্যাপার, ভঙ্গির ব্যাপার, সম্পন্ন সামর্থ্যের ব্যাপার। কোনো অল্পযোগ্য কবিকে কিন্তু এটা হাতে ধরে অনেকটাই শিখিয়ে দেওয়া যায়। অনেকটাই, সবটা নিশ্চয়ই নয়। কবিতা যে 'হয়ে ওঠে'—ভাবনায় আর ভঙ্গিমায়, বিষয়ে আর প্রকরণে, কি বলায় আর কিভাবেই বা – তার প্রথম অংশগুলো অশিক্ষণীয়, মানতেই হবে, কিন্তু বোঝাবার সুযোগটা ফেলনা নয়, সেখানে যোগ্য শিক্ষকের ভূমিকাটা অবশ্য স্বীকার্য।

প্রায়োগিক কাব্যরীতি বিষয়ে বাক্যের পুনরুচ্চারণের সূত্রে কবিতায়—ওদেশে ও এদেশেও—কিভাবে বাঞ্ছিত এক আবহ সৃষ্টি করা যায়, সে রহস্যটা কোনো উঠতি কবিকে হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়া অন্তত অসম্ভব নয়। এলিয়টের যে প্রিয় পদ্ধতিপ্রবণতা ছিল এই পথেই,

The desert is not remote in southern tropics
The desert is not only around the corner,
The desert is squeezed in the tube train next to you,
The desert is in the heart of your brother.

এবং এই রীতির অনুসারী হয়েই যে বিষ্ণু দে কখনো-কখনো এদিকেই ঝুঁকেছিলেন,

পথে পথে চলে অসহায় চোখ
মরামুখে জ্বলে শাদা কালো চোখ
নিভন্ত চোখ জীবন্ত মুখে জ্বালাভরা চোখ, মরীয়ার চোখ
স্বপ্নের চোখ স্রষ্টার চোখ
ভিখারীর চোখ......

কিংবা এই একই কৌশলে জীবনানন্দের 'ভিখারী' কবিতায় যে ইয়েটসের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে,

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে

এসব তো খবরই, কারিগরী সংক্রান্ত জরুরী সংবাদ। আঙ্গিকের দিক দিয়ে যে অন্তত কবিতা 'হয়ে উঠছে', এ-সব পথেও, কবিতার ইস্কুলে, নতুন যাঁরা কবিতা চর্চায় ব্রতী হতে যাচ্ছেন, তথ্য হিসেবে তাঁদের শেখালে কি উপকার পাওয়া যাবে না? শিক্ষান্তে তাঁরা নির্ণয় করে নিতে পারবেন নিশ্চয়ই, এ পথে তাঁর নিজস্বতা মুদ্রিত হবে কিনা, এই রীতির অনুকরণে আদৌ সাম্প্রতি সময়ে নতুন কোনো মাত্রা পাবে কিনা তাঁর উচ্চারণ।

৪

"আমার বিশ্বাস, জাতে যদিও একটু আলাদা, তবু কবিতাও আসলে সাংসারিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, আমাদের এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই তার বিস্তর উপাদান ছড়িয়ে পড়ে আছে, এবং ইস্কুল খুলে, ক্লাস নিয়ে, রুটিনমাফিক আমরা যেভাবে ইতিহাস কি ধারাপাত কি অঙ্ক শেখাই, ঠিক তেমনি করেই কবিতা লেখার কায়দাগুলো শিখিয়ে দেওয়া যায়। 'কায়দা' না-বলে অনেকে বলবেন, 'কলাকৌশল', তা বলুন, কথাটা তার ফলে আর একটু সম্ভ্রান্ত শোনাবে ঠিকই, কিন্তু মূল বক্তব্যের তাতে কোনও ইতর-বিশেষ হবে না!"

এ-সব আপাতরসালো ফলতগভীর মন্তব্য করছিলেন এক কবিই, নীরেন্দ্রনাথ, তাঁর 'কবিতার ক্লাস' গ্রন্থের 'কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি' শিরোনামের সূচনা-পর্বে। আসলে তিনি ছন্দের শিক্ষায় আসরে নেমেছিলেন, এবং নিদ্বিধায় কবুল করা যায়, ছন্দ-মিল সম্পর্কিত আলোচনায় এমন কোনো ফাঁক-ফোঁকর তিনি রাখেননি, যেখানে তাঁকে আলো ফেলতে দেখছিনা। এবং এ সত্য তো অবশ্যমান্য, সে আলো এক ছন্দবিশেষজ্ঞের দেওয়া, স্বক্ষেত্রে যোগ্যতম এক কবির দেওয়া। ছন্দের নতুনতর নিরীক্ষা, মিলের আধুনিক আবহ কিংবা আঙ্গিকের তুমুল ওলোটপালট, এ সবই তো আজকের কবিতার অবিরল অভিজ্ঞান। অথচ ক'জন নবীন কবি এই সবের অনুশীলনে নিজেকে দীক্ষিত করে তবে কবিতার ভূমিতে দাঁড়াবার কথা ভাবেন? ক'জন ছন্দের নিবিষ্ট পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করে, ছন্দ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে সেই অধিকারে ছন্দ বর্জন করার মানসিকতা দেখান? আজ অনেক তরুণ কবিই একধরনের গদ্যে হাত মকশো করে আত্মস্ত ভরিয়ে তুলছেন তাঁদের কবিতাপ্রয়াস। ছন্দে লিখতে তাঁরা চান না, না পারেন না? ব্যাখ্যা যদি এই হয়, ছন্দোহীনতায় দায় কম, তাই প্রত্যাশিত ফসল বেশি, ব্যাখ্যা

যদি এই হয় যে, ছন্দের শাসনে না গিয়ে অনেক কম তাড়নার মধ্যে থেকে মুক্ত মনে লেখা যায় কবিতা, তাহলে বলা যাক, আপনি কবিতার আবহমান কালের গৃহীত একটা শর্তকে উপেক্ষাই করলেন, আশ্রয় নিলেন পলায়নী প্রবণতার কোটরে, সরে দাঁড়ালেন স্বীকৃত পথের বাইরে। আবার এও তো ঘটনা, ছন্দের ভাঙচুর ঘটে যায় ছন্দেরই গরজে/স্বার্থে। এরকম সিদ্ধান্ত টেনে এবং সেই সঙ্গে দুটো প্রশ্ন তুলে 'নিঃশব্দের তর্জনী'-র 'ছন্দোহীন সাম্প্রতিক' অধ্যায়টিতে যবনিকা টানছিলেন শঙ্খ ঘোষ: 'সম্পূর্ণকে স্থির লক্ষ্যে রেখে তারপর তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে দেবার মধ্যে একটা সফলতার প্রত্যয় আছে। সেইটেই করতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিকেরা। কিন্তু একেবারে নতুনেরা কী করবেন? তাঁরা তো প্রায় ধরছেনই না, তাহলে ছাড়বেন কেমন ক'রে'?—রচনাটি ১৯৬৬-র, তবু যেন এই জিজ্ঞাসা আজও ফুরোচ্ছে না, আমাদের কাছে, কবিতা প্রেমীদের কাছে।

কথা হল, যাঁরা হালআমলের শিক্ষানবিশি কবি, যাঁরা ছন্দে শিক্ষিত হতে উৎসুকও বটে, তাঁরা কি সম্পূর্ণ শিক্ষাটাই পেয়ে যাবেন 'কবিতার ক্লাশ'-এ, কিংবা 'ছন্দের বারান্দায়'? সম্ভবত নয়। আর নয় বলেই কি প্রত্যক্ষ চর্চার কথাটা, 'স্কুলিং'-এর কথাটা আমাদের ভাবতে হচ্ছে না? শিক্ষাক্রমের কথা কাগজে-কলমে ধরে ধরে শেখানোর কথা?

ধরা যাক, 'সংবর্ত' থেকে সুধীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমরা পড়ছি, এইরকম,

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ ; বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়ায়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক। 'আশ্রুত তারক' (যযাতি)

এই গাণ্ডিক কাঠামোকে যে বুদ্ধদেব বসু রাবীন্দ্রিক 'বলাকা'র ছন্দবিন্যাসে স্থাপন করে একবার দেখিয়েছিলেন,

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ
বনবাস
প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে অতঃপর অনিবারণীয় ;
এবং বিজ্ঞানবলে পশ্চিম যদিও
আয়ুর সামান্য সীমা বাড়ায়েছে ইদানীং, তবু

সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের প্রভু
বার্ধক্যের আত্মাপহারক।
আশ্রুত তারক।

এর মধ্যে কি একটা মূল্যবান শিক্ষা ছিল না? এটা কি শুধু গ্রন্থস্থ আলোচনাতেই নতুন কবিদের কাছে গ্রহণীয় ঠেকবে, নাকি এর জন্য সরাসরি পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকলে তা ফলপ্রসূ হত বেশি? গদ্য-পদ্যের সমাহারে অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দপ্রযুক্তির এই যে কুশলী আশ্চর্যতা,

বেড়া পার হল, পা চলো।
সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ;
গাছের আড়ালে, বলো
কে স্থির দাঁড়িয়ে
আলো নিয়ে
ফিরে আসার সাঁঝ 'ঘর', খসড়া

স্বরবর্ণে পরিবেষিত এই প্রচ্ছন্ন মিল যে লক্ষ্যের বাইরে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে (এবং এখানে তা কবির কাম্যও ছিল বটে), সে খবরটুকু পৌঁছে দেওয়া যাবে কি করে আজকের কবিদের কানে? শুধুই কি এটা তাঁরা শিখে নিতে পারবেন বই-এর লেখা থেকে, নাকি এখানে আবৃত্তি করে, পড়ে শুনিয়ে, ছন্দমিল বিশ্লেষ করে একটা কার্যকরী ক্লাসের পরিমণ্ডলও গড়ে তোলা দরকার?

৫

শেষ পর্বে আসি, মিলের প্রসঙ্গে। এটা তো ঠিক, এখন যাঁরা কবিতা লেখায় মনোযোগী, তাঁরা অনেকটাই তৈরী জমি পেয়ে গেছেন, সমৃদ্ধ সামর্থ্যে আঙ্গিকমনস্ক হয়ে এগিয়ে যাবার মতো যোগ্য পূর্বসূরী তাঁরা দেখেছেন প্রাক্তন প্রজন্মে। মিলের কারুকৃতি একসময়ে কিভাবে কবিতার শরীরে ছিল আর এখনই বা কিভাবে, সাম্প্রতিক রেওয়াজে মিলের গ্রহণ না বর্জন কোন্‌টা কতখানি কার্যকরী, কিংবা মিল জিনিসটাকে সম্পূর্ণ নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেই বা কবিতার লাভ-লোকসান কতটা—এ-সব হাজার রকম নিরীক্ষায় আজকের কবিরা নিয়োজিত রাখতে চেয়েছেন/চাইছেন নিজেদের। এবং এ-সব নিয়মিত ও অনিবার্য টানাপোড়েনের প্রশ্নেই কবিতা তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে এযাবৎ,—এ ঘটনা তো না মেনে উপায় নেই। লেখকের নাম বলতে পারব না,

তবে বেশ কিছুকাল আগে একটা ইংরেজি অভিধান গোছের বই হাতে এসেছিল যেখানে মিলের সম্ভাব্য তালিকা পেশ করা হচ্ছে সযত্ন কৌশলে। কবিতার ইস্কুলে একেবারে শিক্ষানবিশী কবিদের ছন্দ/মিলের প্রথম পাঠ হিসেবে ব্যাপারটা খুব উপেক্ষনীয় নয় হয়ত। বোধের কবিতায় মিলের জগতটা ঠিক ওভাবে আসে না, স্বীকার করতেই হবে; তবে প্রাথমিক চর্চার অঙ্গ হিসেবে দেখলে বোধহয় ব্যাপারটাকে অতটা আপত্তিকর নাও মনে হতে পারে। অন্তত একটা পরীক্ষামূলক ভাবনা মাথায় রেখে ওদেশে ওরা তো এমন বই ছাপবার সাহস দেখাতে কুণ্ঠিত হয় না। এ-টাও আমার ভাবায়।

বিষয়ের পাশাপাশি ছন্দ যেমন, ছন্দের সঙ্গে তাল ঠুকে মিলও তেমনি বাঙলা কবিতায় এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে নেই। অফুরন্ত স্বপ্ন আর সম্ভাবনায় ভরপুর এর যাবতীয় রহস্য। ঠিক এই মুহূর্তে কবিতা পাঠকের প্রত্যাশাও অন্যখাতে বইছে। পুরনোপন্থী হয়ে সে একই আবর্তে ঠেকে থাকবে কেন? নতুন জানলার অভাব নেই, অপেক্ষা শুধু খুলে দেবার, আর সেই পথেই জেগে উঠবে নতুন আকাশ, নতুন পৃথিবী। আজকের কবিতার পাঠক কবিতায় 'রাত্রি' উচ্চারিত হলে 'যাত্রীর' জন্য অপেক্ষায় থাকেন না, বরং শব্দসঞ্চারে তিনি এগিয়ে যান 'অভিযাত্রিক'-এর দিকেই: খরচ-হয়ে-যাওয়া মিলে তাঁর অনীহা, জিভের স্বাদ বদলেই তার আগ্রহ অনেক বেশি। কবিতার ইস্কুলে যারা অন্ত্যমিল-চর্চায় সদ্য পড়ুয়া, তাঁদের হাত ও কান এই ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া যায়।

একটা পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত টানি, যেখানে অন্ত্যমিলের নিরীক্ষামূলক চমক লক্ষ্য করার মত:

The centuries will burn rich loads
With which we groaned,
Whose warmth shall lull their dreamy lids,
While songs are crooned.
But they will not dream of us poor lads
Lost in the ground.

কিন্তু শুধু ওদেশে কেন, এমন মিলের নজীর কি নেই আমাদের ঘরানায়? হাল-ফিলে যাঁরা কবিতা লিখছেন, যাঁরা মুক্তমনে শিক্ষিত হয়ে ওঠবার ব্যাপারে নিষ্ঠিধ, যাঁরা প্রয়োগ করবার আগে এর কৌশলটা রপ্ত করতে চান মনে-প্রাণে, তাঁদের হাতেই একজন দক্ষ শিক্ষক তুলে দিতে পারেন এমন উজ্জ্বল দেশি প্রতিতুলনা:

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি
ছিন্নকন্থা দলেই ভেড়ে সামন্ত

—বিষ্ণু দে

কিংবা

কিসে তোমার কষ্ট জানি, কোথায় তোমার দুঃখ—
না পেলে ভাত, তাকিয়ে থাকো প্রভুর অন্তরীক্ষে

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এখনকার কবিতা এই জাতের মিলকেই আশ্রয় করে নিতে চাইছে,—একটু তির্যক প্রবণতায়, তেরছা ভঙ্গিমায়, ওদেশের 'Stant rhyme'-এর আদলে। সদ্য কবিকে সাহস জুগিয়ে শিখিয়ে দিতে হবে এখনকার মিলের অ-গতানুগতিক চরিত্র, কিভাবে 'একা' 'দেখায়'-এর সঙ্গে জোট বাঁধে, অথবা 'লোকে'-র সঙ্গে 'শোকেই', কিংবা 'আলো'-র সঙ্গে 'বালক'। ভাবা যায় এইসব মিল ?—কুচ্ছিৎ/পা ধুচ্ছি, খেলা/অ্যালার্ম, পার্কে/নারকেল অথবা রক্তগোলাপ/আহিরটোলা! অথচ এ-সব উদাহরণ আমরা কুড়িয়ে পাচ্ছি এই হালফিলের কবিতায়। আপনারা কি মনে করেন, এসব প্রায়োগিক কৌশলের অন্তত কিছুটা কি 'স্কুলিং'-এর কল্যাণে শিখিয়ে দেওয়া যায় না কিংবা আরো একটু ছন্দসজাগ সুস্থিরতা কি ফিরিয়ে দেওয়াটা অসম্ভব উঠতি কবিদের সাম্প্রতিক প্রয়াসের ফাঁকে ফাঁকে ?

কবিতা নিয়ে দু-টুকরো

১ ॥ রাহুল কৃত্যায়ন

শিল্প আর কারুদার মধ্যে তফাৎ নিশ্চয়ই একটা আছে। ষ্টাইল আর ফ্যাশনের প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিনন্দিত অমিত-টিপ্পনী রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় স্বভাবতই: মনে পড়ে। বস্তুত রাহুল পুরকায়স্থর কবিতার বইখানা নিয়ে কয়েকদিন থাকার পর মুখোশ ও মুখশ্রীর ব্যবধান মনে পড়ল এই কারণেই যে, নতুন যাঁরা লেখালেখি শুরু করেছেন গত পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে তাঁদের অনেকেই দেখছি কথা কম বলার পক্ষপাতী, শ্রীমান রাহুলও এর ব্যতিক্রম নন। ভালোই। কম কথাতেই কাজ বেশি হয়; কবিতা পড়তে-পড়তে গড়ে নিতে হয় তার একটা ব্যক্তিগত সম্ভাব্য আদল। কিন্তু শব্দের ভার খসানোর আগে শব্দের ক্ষমতা, আণবিক সংগঠন ও সংক্রাম সম্বন্ধে কবির একটা স্বচ্ছ মনীষা অর্জন করা দরকার। দরকার ঈপ্সিত লক্ষ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ককে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছাখার, বাজিয়ে নেবার। যাঁদের এটা আসে তাঁদের নৈপুণ্য ও সাফল্য যশার্থী পন্থকারদের অনুচিকীর্ষায় বিভ্রান্ত করে। এঁরাও ছিপছিপে ছোট ছোট কবিতা ফাঁদেন, স্পেস দেন দু-তিন লাইন অন্তর, এমনকি কখনোবা প্রতি লাইনেও। কিন্তু পড়তে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে যায় আমাদের। একটা অক্ষরও চিনতে পারি না। একেই বলে কায়দা। রাহুলের মধ্যে এই জিনিসটা স্বস্তিকরভাবে কম। কম কথার ঝোঁক আর অনিবার্যতা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষিত ও ইসথেটিক ভেদবুদ্ধি 'অন্ধকার, প্রিয় স্বরলিপি'র (জানুয়ারী ১৯৮৮) বেশকিছু কবিতায় স্পর্শগ্রাহ্যতা পায়।

কোন স্কেলে তাঁর স্বরক্ষেপ হবে সেটা মুখপাতের শিরোনামহীন তিনটি যুগ্মকে বেঁধে দেওয়া আছে। বেশ নীচু স্কেল, গলা খাদেই বলছে এবং একটুও বেপর্দা হয়নি। হাসপাতালের করিডোরে ঝুঁকে থাকা পুরোনো রোদ্দুরকে চমৎকার স্পেশের ব্যবধানে ঘুরিয়ে দিয়েছেন ছ-আনায় আটসের চালের গন্ধঘন বাঙালি স্মৃতিচ্ছন্নতায়। সঙ্গে সঙ্গে 'হাড়ের শেকল', হাসপাতাল', 'পুরোনো রোদ্দুর' সব ছবিই সমগ্রতায় গাঁথা হয়ে যায়; বর্তমানের রুদ্রতায় মিশে যায় অতীতের স্বস্তিময় কিংবদন্তি, যা সংগত কারণেই আশা করা যেতে পারে আশু বা সুদূর কোনো ভবিষ্যতে নবীকৃত হবে। (আচ্ছা, কথাটি কি 'করিডোর', না 'করাইডোর' ?) বলতে ভালো লাগছে রাহুলের এমনিতর প্রমিতি আমাদের কল্পনাকে চমৎকার উশকে দেয়। জমে যায় 'কাকতাড়ুয়া'র শৈশবসন্নিধানের

বুভুক্ষা, 'মানচিত্র'-র প্রতিকারহীন জিঘাংসার 'হিমরাত্রি' এবং কত আর নাম করব।

কিন্তু পছন্দ হয়নি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মনে রেখে লেখা ডাইসে-ফেলা মরশুমি নমস্কারি পঙ্‌ক্তি, 'সওদাগর'-এ 'সূর্যমুখী'র মতো আধুনিক গানমার্কা শব্দ, 'এই হয় এই-ই' কবিতায় 'ঝকঝকে দিন চাই...' ধরনের আবৃত্তিচটক লোকরঞ্জন। অথচ লঘু চালে 'ছুঁস না কমণ্ডলু...' স্মৃতিধার্য হয়ে ওঠে চারমাত্রার নির্ভুল প্রতিসাম্যের জন্যেই নয়, খুবই সাংকেতিক ও সান্ধ্যভাবিক একটি বোধের ভেতরে ঢোকবার প্ররোচনাও তৈরি করে দেয় কবিতাটির আপাতলঘু ধরনধারণ। মনে হয় ধরতে পারছিনা কেন কবিকে, আর তখনই ঐ ছন্দের খোশাটোসা ছাড়িয়ে দেখতে চাই রাহুল কি যৌবনের দুঃসাহসী ব্রতচর্যার বন্দনাই করতে চেয়েছেন, না 'কব্জি ডুবিয়ে' মৃত্যুর ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনে কোনো ইতিহাসগত তাগিদই তাঁর প্রতিপাদ্য? এসব কবিতার মজাই অন্যধরনের। পণ্ডিত-বিদূষকের চোখের নীচে বিষাদের সরু দাগের মতো। আসলে 'এই হয়..' কবিতার বাঁধুনিটাই কেমন যেন আলগা। তা এইরকম এক-আধটা দাগ থাকা ভালোই তো, রাহুলকে বেশ ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়!

এবারে ভয়ে-ভয়ে বলব দু-একটা কিন্তুর কথা? মাত্রাবৃত্তের মতো সহজতম ছন্দেও 'ভাত উৎসব'-এ 'আস্তরণহীন প্রেতচ্ছায়ায়' পিছলে গেলেন তিনি কী করে? আর 'যুদ্ধ'-এ "পোহাচ্ছিল বিনিদ্র শ্রুতি জুড়ে" ঠিক আছে তো? পরন্তু স্বরবৃত্তের কাঠামোয় লেখা 'এ তো বড় রঙ্গ...' কবিতার শেষস্তবকে 'ফুটপাতে' আর 'অনাবিল কৌতুকে' কি মেলে? আগের দুটো স্তবকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইন একেবারে খাপে খাপে মিত্রাক্ষর, তাই এই প্রশ্ন। পয়ারের মধ্যেও আমরা কিন্তু "রাতের ভূগোল জুড়ে অজ্ঞাতবাস", "পাতালে শব্দ বাজে/শব্দহীন ভয়" ইত্যাকার লাইন পড়তে পেয়েছি। তা এরকম এক-আধটা ব্লেমিশেস থাকা ভালোই তো। বলবার মতো যা হোক দু-একটা কথা খুঁজে পাওয়া যায়।

রাহুলের পরবর্তী বই আবার কবে বেরুচ্ছে?

২॥ কলাবৌ, সংযম-ধরণে

শ্রীমান সংযম পালের হাতটি তৈরি, তাঁর লেখার মধ্যে যত্ন আছে। কবিতার শুরু থেকে শেষ অব্দি একটা পারম্পর্য দেখা যায়। সুতরাং তিনি সুখপাঠ্য—এরকমই মনে হত বিভিন্ন কাগজে তাঁর টুকরো লেখাপত্র পড়ে। এখন 'কলাবৌ' (এপ্রিল ১৯৮৯)

নামের ৪০ পৃষ্ঠার এই ছোট পেপারব্যাকটি হাতের কাছে থাকায় ধারণাটি যাচাই করার সুযোগ পেলুম। ধারণাটি ভুল নয়। 'কবিতা লেখার দুঃসহ বাসনা'য় সংযম লোভ, পাপ আর মনস্তাপআকীর্ণ পূর্বসূরির পথ ধরে চিরন্তন ভিক্ষুক হয়ে পদযাত্রায় নেমেছেন: "যে পথে হেঁটে গিয়েছে পাপী শনিরাজের বলি (সে পথে আমি মৃত্যুহীন অমর ভিক্ষুক") —কবি হিশেবে তাঁর এই ভ্রামণিকতা খুবই জরুরি; এবং সেকথা বলেওছেন বেশ মরমী গলায়। আর কিছু নয়, এই মরমী মেজাজের সারল্যই তাঁকে আমাদের স্বজন করে তুলতে পারে। ভালো লাগে তাঁর চাউনির ভয়ংকরসুন্দর অভিজ্ঞতার সংবেদ: "একটি পাতার অহিংস নামা দেখে / কাঁধে ঘাম জমে, হাত শাদা হয়, পা / .. ...মনে হয় এক প্রেতিনীর হিম নখ / আমার রক্ত ছিঁড়েছিঁড়ে করে ক্ষার" (অহিংস)। যে-ধারণার কথা গোড়ায় বলেছিলুম সেটাই কি সমর্থন পেল না এখানে?

কিন্তু মনে হয় সংযমের অল্পে রুচি নেই। ভালো কিছু পংক্তি লিখে উঠতে পারা যেন কোনো গুণ নয় তাঁর কাছে। মনে হয় কবিতাকে বেশ বড়সড় একটা জায়গায়, আমাদের পুরাণ ও লোককথার সাধারণ্যে মেলাতে চাইছেন তিনি। শিব-দুর্গা-অন্নপূর্ণা-গণেশ—কালকেতু-ফুল্লরাদের বিভিন্ন বর্ণের দৈনন্দিনের মিথ-এ সাম্প্রতিকের অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে ঘনাতে চাইছেন যেনবা এক সম্বৃত এপিক পরিব্যাপ্তি। এই ধরনের কিছু কবিতা পড়লুম সংযমের। পড়লুম তাঁর গ্রন্থের নাম-কবিতাটি, যা শেষ হচ্ছে এইভাবে: "...মা আমার এত / অন্নের মালিক, তবু অন্নে তিনি দাস! / না, বিয়ে করব না, ঠিক এরকম ভেবে / বাইরে বেরুই, তবু বড়ছেলে হই/আর তাই কলাবৌ, আর তাই আজ / গাছের ভর্তা, আমি আজও কুমার", পড়লুম 'অন্নপূর্ণার খেদ', 'শিবসঙ্গম', 'শিবের সংসার চিন্তা'। খারাপ লাগেনি কিন্তু। কবির পক্ষে আত্মতৃপ্ত এবং আশুতোষ না হওয়াই সুখের। তবে উচ্চাশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের উচ্চতা সম্বন্ধেও আশা করব সংযম অবহিত থাকবেন। এ-ধরনের লেখায় পণ্ডিতি এবং বৈদগ্ধ্য, মিথরহস্য এবং দুর্বোধ্যতা প্রায়শই গা ঘেঁষে থাকে। আশঙ্কা তো থাকেই গুলিয়ে ফেলার। সত্যি বলতে কি, 'সমুদ্রকীট', 'রাত্রিকথামালা' ধরতে পারিনি।

সংযমের কোনো কোনো রচনায় শব্দব্যবহারে কিন্তু অসংযম লক্ষ্য করেছি। যেমন: "দেবতাকাঙ্খিত ফল, জল-আগুনের / মালকিন, তুমি কি আমাকে নিয়ে যেতে পারো..."ইত্যাদির মধ্যে আচমকা একটা হিন্দি 'মালকিন' শব্দটা লাগিয়ে কী ভালোটা করলেন তিনি? শুধু কানের পর্দায় ঝাঁ করে ধাক্কা দেওয়া ছাড়া কী বলব একে?

"কীভাবে বীজের ক্ষতি সভ্যতার ক্ষতি করে দিয়ে গেছে হারামি আগুন"—আগুনের আর কোনো লাগসই অপবিশেষণ খুঁজে পেলেন না তিনি? 'মালকিন' আর 'হারামি'—এইসব শব্দে নিশ্চয়ই কোনো ছুঁচিবাই আমার নেই, কিন্তু ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত আবহাওয়া তো তৈরী করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু বিষণ্ণ লিরিকাল মেজাজে কবিতার মধ্যেই, বোধহয় তিনি নিজেও জানেন এ-কথা।

ছন্দের ব্যাপারে, বিশেষত পয়ারের গঠন নিয়ে কিছু বলব না। ধরে নিচ্ছি আমারই ভুল হয়েছে "বরযাত্রার দিনে হঠাৎ পড়েছে মনে হাতে নেই জাঁতি"—লাইনে 'বরযাত্রা'কে সাতমাত্রা মনে করা, "আমি একদা সন্তান", 'আমার বন্ধু নেই"—কে বেসুরো ভেবে নেওয়া। বয়েস বাড়লে আত্মবিশ্বাসও যে কখনো কখনো আলগা হয়ে যায়। এতটাই, যে, 'প্রিভিলিজ' শব্দটার বানান ঠিকঠাক লেখার পরও অভিধান খুলতে হয় আজকাল।

—শিবশম্ভু পাল

অন্ধকার, প্রিয় স্বরলিপি/রাহুল পুরকায়স্থ/উলুখড়, কলকাতা-৩১/ছ টাকা
কলাবৌ/সংযম পাল/লেখককর্তৃক প্রকাশিত/ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর/পাঁচ টাকা

ঘরেও দিগন্তের প্রতিশ্রুতি

শিবশম্ভু পালের কবিতা

কোনো-কোনো কবিকে যে নিরন্তর ঔদাসীন্যের শিকার হয়েই কবিতা লিখে যেতে হয় অবিচ্ছিন্নতায়, এটা অবশ্যমান্য একটা ঘটনা বৈকি। ঔদাসীন্য এই কারণে যে ১৯৬৯-এ যার প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়' প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁকে বাধ্যতামূলক প্রতীক্ষায় থাকতে হল দীর্ঘ কুড়িটি বছর, তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের জন্য। অপেক্ষার অবসান হল ১৯৮৯-এর বইমেলায়, 'প্রাতিক্ষণিক' সাহচর্যে ও ঔদার্যে উৎপন্ন হল তাঁর বহুপ্রত্যাশিত 'প্রতিশ্রুতি বার বার'। সম্পন্ন এই কবি কিন্তু মধ্যবর্তী সময়টায় গ্রন্থস্থ না হয়েও অবিরল কবিতা নির্মাণেই নিয়োজিত রেখেছেন নিজেকে ('স্বীকার করেছি এই অতিরিক্ত শ্রম কবিতায়/আত্মবিনিয়োগ', কবিতা লিখিয়ে নিলে: ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়), নিজস্ব প্রবণতা ও আঙ্গিকের ক্রমউত্তরণ ঘটিয়েছেন অজস্র পত্রিকার সূত্রে, এবং স্বকীয় ঘরাণায় স্থিত থেকে অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টিদাক্ষিণ্য কেড়ে নিয়েছেন ঈর্ষণীয়ভাবে। তবু আমাদের মনে রাখতেই হয়, মাত্র দুটি বইতেই সঞ্চিত হয় নি তাঁর কাব্য জীবনের যাবতীয় ফসল; অনেক বর্জনের পথ পেরিয়ে তবেই এইসব নির্বাচিত সংকলন। আমরা জানি, কবিতা জিনিসটা 'হয়ে ওঠে', আর এরই উল্টো পিঠে উঁকি মেরে যায় অন্য একটা সত্য, প্রচ্ছন্ন অভিমানে কবিকে তখন সবাক হতেই হয়, 'অন্তত খান চারেক প্রমাণ সাইজের বই তো হতেই পারত। কিন্তু খুবই স্পর্শকাতর এই প্রসঙ্গে ভাববাচ্যের নিরাপদ অস্পষ্টতায় বড় জোর বলতে পারি, হয়ে ওঠে নি আর কি।'

প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে তাল ঠুকে অগাধ সামর্থ্যে যিনি কবিতাকে অঙ্গাঙ্গী করে নিয়েছেন, কবিতার জন্য যিনি চাইতে জানেন ভালবাসা আর রক্তদান, যাঁকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিতে দেখেছি চৈতন্যের অন্ধকারে, মানুষের ভ্রষ্ট চলাচলে, ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ থেকে যিনি ছেঁকে নিতে চান 'বিচক্ষণ চয়নিকা', তাঁকেই অন্তত একবারের জন্য উচ্চারণ করতে হয় বিপন্ন ভঙ্গিমায়; 'কিছুই হল না লেখা, পৃষ্ঠা জুড়ে পড়ে থাকে মীমাংসাবিহীন/শব্দের বিশীর্ণ মৃত্যু, স্খলিত কয়েকটি চিত্র, দুরাভাষ, ভয়.....' (প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি)। কবিতায় শব্দের ব্যবহারে যিনি সাবধানী, কুশলী অথচ সাবলীল, এবং একই সঙ্গে যিনি আস্থাবান এই সত্যে যে শব্দ প্রতিষ্ঠায় কবিতার অন্যতম উন্মোচন, তাঁকেই মানায় এই অনায়াস উপলব্ধি আর উদ্‌ঘাটন: 'অথচ বারুদচাপা বর্ণচোরা হতে হবে প্রতিটি শব্দকে/শুধু একটু আগুনের কণা যদি চক্ষু থেকে, সংবেদনা থেকে/লেগে যায়, বিস্ফোরণ...'

(জবানবন্দি)। কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনবদ্য দক্ষতায় ও বিরল প্রত্যক্ষণে তিনি মেশাতে জানেন গার্হস্থ্য প্রেক্ষিত, প্রশিক্ষিত সপ্রতিভতা, ঘনবদ্ধ বাক্‌ভঙ্গি আর মুহূর্তেই তীক্ষ্ণ শব্দচেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাঁর যাবতীয় মুদ্রিত আবেগ, ব্যক্তিগত মনন, সমাজমনস্কতা, যন্ত্রণার্ত অস্তিত্ব,—

অনেক অনেকদিন পর
সমস্ত শরীর ফের যন্ত্রণায় দুমরে মুচড়ে গেছে
প্রখর সূর্যের মধ্যে কখন আঁধার ঘনিয়েছে
—অনেকদিন পর

ভালোবাসা দাবি করে শ্রেণীচেতনার অবলোপ
নতুবা
অনড় অটল থাকে যুবা
গলে না বরফ — অবলোপ, শ্রেণীচেতনার

এত চিন্তা ধাতে সয় না, বরং ব্যবস্থামত সিনেমায় গেলে
ভালো হত, বসে-বসে ঘণ্টাদুই আমাদের ব্যক্তিগত চামড়া সেঁকে নেওয়া
বসে-বসে ঘণ্টাদুই বুনতাম জোড়াসাপ প্যাটার্নের মহার্ঘ জাম্পার
আমাদের দশ আঙুল শিশুর মতন খেলত, খেলতে-খেলতে আটনম্বর কাঁটা
—প্রায় সাতমাস তেরদিন পর

...মানুষের ধৈর্য আর অপেক্ষার ঘাম
তাদের পায়ের নিচে শের শা'র রাস্তা, ধুলো, খানাখন্দ, কাদা
তারও নিচে দেখা যায় স্মৃতিচিহ্ন, দু'এক টুকরো লোহার লাইন—
এখানেই একদিন শিবপুর ট্রামডিপো ছিল
—শিবপুর ট্রামডিপো

এবং এসব থেকেই—কখনো বাঞ্ছিত গাম্ভীর্যে, সহজ আলাপচারিতায়, কখনো বা চর্চিত স্মৃতিরোমন্থনে—আহৃত হতে দেখি শিবশম্ভু পালের উচ্চারিত উপকরণ, শাহরিক মানসিকতায় ঋদ্ধ তাঁর কবিতার রস ও রসদ। নিজস্ব বোধ থেকে গড়ে তোলা কবিতার অভিধা জ্ঞাপনেও তিনি স্পষ্টবাক, দ্বিধাহীন :

'বস্তুত কবিতা নিয়ে কোনো গম্ভীর বোলচাল আমার একেবারে
আসে না। লিখে যাই, এই অব্দিই আমার দৌড়। চোখ-কান
খোলা রেখে যা ছাখবার দেখি, একটু-আধটু করে সেই
ছাখার মধ্যে ঢুকে যাই, ব্যা, বলা ভাল, যেতে চেষ্টা করি।
যা পাই, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে এসে ঘষে মেজে তাকে
পাঁচজনের কাছে ফিনিশড প্রোডাকট হিসেবে ছাড়তে গিয়েছি।
অনেক ঠেকে ও ঠকে শেষ পর্যন্ত বুঝেছি, একদিকে অভিজ্ঞতা
আর অন্যদিকে শব্দবোধ—দুদিকের ছেদবিন্দুতেই কবিতার অবস্থান।'

'ফিনিশড প্রোডাকট', – শব্দজোট লক্ষণীয়, বলা যাক শিল্পিত নির্মাণ, শীলিতও হয়ত বা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুবাদে আমি জানি কতখানি নিঃসীম প্রযত্নে চর্চিত তাঁর প্রত্যেকটি কবিতাপ্রয়াস, কত ভাঙচুরের পথ পেরিয়ে, সংশোধন ও পুনর্লিখনের দাবি মেনে নিয়ে এক-একটা পঙ্‌ক্তির উদ্ভাস ঘটে তাঁর হাতে ('কেন যে অনেক পদ্য পত্রপাঠ করেছি বাতিল/কেন এই নির্বাচন, কে বলবে ?' – সম্পাদকীয়তা : ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়), চূড়ান্ত শরীরে পেশ করবার আগে পর্যন্ত কত না নিরীক্ষায় তিনি বিন্যস্ত করতে চান তাঁর অনুভূতিমালা, ছন্দে-নিশ্ছন্দে, মিলে-অমিলে, এবং সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে এক ঝকঝকে স্মার্টনেস, টানটান মস্থণ প্রকাশরীতি, এক মার্জিত নাগরিক আস্বাদন : 'এসব পুরোনো গল্প/নতুনের মধ্যে হয়তো র-সিল্কের তুমুল পাঞ্জাবি/অথবা নাতিশীতোষ্ণ অস্পষ্ট বিদেশপথ খুলে যায় সুবিনয় রায়ের/সম্বৃত গানের মন্ত্রে' (সে আবার) কিংবা 'কমলালেবুর সঙ্গে জমে ওঠে জু-গার্ডেন, শেষ ডিসেম্বর' (সরো, তোতন রয়েছে), অথবা 'দিনভোর আমাদের সাইক্লোষ্টাইল করা বাক্য বিনিময়' (নীরোর সঙ্গে রাত্রিযাপন), ইত্যাদি। বলা যাক, এই আত্যন্তিক নগরমনস্কতা তাঁর ষ্টাইলেরই একটি ধাঁচ গড়ে তোলার সহায়ক, চিক্কণ সপ্রতিভতার একটি অনিবার্য উপলক্ষ্য,—যেখানে তিনি পরম আস্থায় ও আয়াসহীন মুন্সিয়ানায় ইংরেজী শব্দের অব্যর্থ মিশেল ঘটাতে পারেন, জানেন, দেশজ বাক্‌রীতির ফাঁকে, এবং তা লঘু লোক-দেখনাই নয়, বরং উপস্থাপনার গুণে বিকল্পরহিত। কিছু টুকরো দৃষ্টান্তে আমার বক্তব্য দৃঢ়তর হবে :

১। সুযোগ নেবার জন্যে অ্যাগাইলাম প্রার্থনা করেছি পৃ: ১৭
২। রবীন্দ্রসঙ্গীত, হিন্দি ফিলমিগানা, বলদেওসিংমার্কা প্রাদেশিক জোকস্ পৃ: ১৮
৩। ফিরে পাওয়া কিছুক্ষণ আন্তর্জাতিক মাটি ধ্রুব স্যাংচুয়ারি পৃ: ২০

৪। রাস্তার ওপর/অর্বাচীন কারা দুটি নির্বিকার ক্রি-ষ্টাইল রবীন্দ্রসঙ্গীত/
গেয়ে যাচ্ছে পৃ: ৩৮

৫। কুড়ুলে দিয়েছে ধার পাশপোর্ট ফটোগ্রাফ, পোষ্টাল অর্ডার পৃ: ৪৮

৬। চিয়ার্স নন্দিত সুস্থ বিবাহবার্ষিকী আর বান্ধবীর প্রমিত কৌতুকে পৃ: ৫৬

তবে একটা কথা এখানে। স্মার্ট ইংরেজি শব্দের প্রতি এক ধরনের মোহজ দুর্বলতায় আক্রান্ত হতে দেখি তাঁর অনেক কবিতারই পঙ্‌ক্তিবিন্যাস। যেখানে তা আন্তর দাবি থেকে প্রযুক্ত হয়, সেখানে সংশয় নেই, কিন্তু এমনও চোখে পড়ে, যে-সব দৃষ্টান্তে এই সপ্রতিভতা খানিকটা আরোপিত, হয়ত বা আবেগের স্ফূর্তিকে অনাবশ্যক আহত করে চলে যাচ্ছে। সেখানে একটু দ্বিতীয়ভাবনার অনিবার্যতা এসে পড়ে বৈকি।

আগেই উল্লেখ করেছি ঘরোয়া প্রেক্ষাপট তাঁর অনেক কবিতার প্রারম্ভিক উপজীব্য, কিন্তু আরো বড় কথা হল, এখান থেকেই তাঁর কবিতাভাবনা উত্তরণ ঘটিয়ে ছড়িয়ে যায় দূরে, প্রতিশ্রুত দিগন্তরেখায়, অন্তস্তরী দার্শনিক উপলব্ধিতে। প্রথম বইতেও ছিল এই বিশিষ্টতার প্রচুর নজীর : উন্নয়ন কলকাতার চোরাগোপ্তা 'রেশনমাফিক সুজনতা' তাঁর দৃষ্টিতে বিচূর্ণ ইঁটের মতো চৌকাঠের ওপারে পড়ে থাকে ; বর্ষার টালাপার্ক কিংবা মিছিলের কলকাতা মুহূর্তেই ডানাভাঙ্গা স্কাইলার্কের অনুষঙ্গে প্রতিভাত হয় ; 'কখনো কখনো/ভেন্টিলেটার থেকে চুঁয়ে পড়া রুপন জ্যোৎস্নায়/অসম্ভব ভাগ্যবান মনে হয় নিজেকে, তখন/কেবল গভীর থেকে বাঁশরি বাজায় দূর দুরান্তের বিপুল সুদূর' (একটিই কবিতা)। দূরছোঁয়া দিগন্তস্পর্শী কবিতার অভাব নেই সাম্প্রতিক গ্রন্থেও, এবং নেই বলেই আমরা চমকে যাই এমন এক সংযতবাক অসামান্য স্থিরচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে : 'ভালো লেগেছিল খুব গতরাত্রে পাশাপাশি বসে/প্রবাসের মেঘছায়া স্পর্শ করে বহুদূর হাঁটা' (সন্নিধান) একখানি অপ্রধান মেঘ যখন ঘরের শূন্য ধূসর ছায়ায় ভরে দেয়, তখন সে ছায়ার মধ্যে তিনি কোনো 'নৌকো' খুঁজে পান না, পান না কোনো 'আত্মস্মৃতি'ও ; বিশ্রী গন্ধ গামছাকাঁধে যখন একটা দেহাতি মানুষ নির্বিকার বসে পড়ে ট্রামে তাঁর পাশের সীটেই, দার্শনিক প্রতিচ্ছায়া ঘনিয়ে আসে সেখানেও : 'চিৎপুরের ট্রাম চলছে হাঁটিহাঁটি, ট্রাম নয় ঠিক/গন্ধটা গামছারও নয়, ইতিহাসও এর মধ্যে মিশেছে খানিক' গন্ধ)।

এই মূল্যায়নের শেষ মন্তব্য করি তাঁর ছন্দ-মিলের কুশলী দক্ষতা সম্পর্কে। বর্তমান প্রজন্মে যে-সব কবিদের ছন্দোময় নির্মাণে এক তীব্র অনীহা আছে এবং যাঁরা

ছন্দের চর্চায় উদ্‌গ্রীব,—এই দুই শিবিরের কবিসম্প্রদায়ের কাছেই শিবশম্ভু পালের দুঃসাহসিক ছন্দ-নিরীক্ষা ও মিল-প্রবণতা একটা স্বাস্থ্যপ্রদ শিক্ষা, একটা অনুকরণীয় নজীর। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে অজস্রতায় ছড়িয়ে আছে ছন্দে গ্রথিত যে কবিতাগুচ্ছ, তার দু'চারটের উল্লেখ করি, 'লুপ্তোপমা', 'শিশু কিংবা প্রবীণ', 'সেখানেই বঙ্গোপসাগর', 'দ্বিপ্সা', 'রোগ', 'বিভেদপন্থা', 'দুপুরে', 'দুজন রাজসাক্ষী' 'পারিবারিক পদ্য, তোটক ছন্দে', 'বিভ্রম', 'নশ্বরতা বিষয়ক', ইত্যাদি। একটি কবিতার ছন্দাংশ পেশ করি নিখুঁত মিলের দৃষ্টান্ত যোগান দিতে,

সমালোচকের লাগে একঘেয়ে
আমি পুড়ে যাই শুধু সন্দেহে, ঘুমের মধ্যে
ভেঙে যায় ঘুম, তিনমুহূর্ত
লাগেনি সময় স্বতঃস্ফূর্ত নালেখা পদ্যে

—খেলার খবর

খেয়াল করুন প্রথম দু-লাইনের অন্ত্যমিল,—কী সপ্রতিভ চতুরতায় অব্যর্থ হতে পারেন তিনি। মিল ও মিলের সম্মোহন সঞ্চারে পেশ করি আরো কিছু : ভাঁড়ামো : সাড়া মন, নিরীহ : প্রয়োজনীয়, শ্বেতকরবী : পরভৃৎ, শিল্প : নীলবন, ক্যাসেট : অভ্যাস, নাদির শা : ঈর্ষা, অতীব : অপ্রতিভ, প্লাবনপ্রতিম : সম্প্রতি, অনুষ্টুপ : পরপুরুষ, ইত্যাদি। মিলের সাম্প্রতিক মেজাজ যাঁরা মেনে নিয়েছেন মুক্তমনে এবং যাঁরা মেনে নিতে পারেননি, তাঁদের হাতেই তুলে দেওয়া যাক এইসব অবাক-করা হঠাৎ-আলোর ঝলকানি।

— সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ঘরে দূরে দিগন্ত রেখায়/শিবশম্ভু পাল/সাহিত্য পত্রগ্রন্থ, ১৯৬৯/তিন টাকা
প্রতিশ্রুতি বারবার/শিবশম্ভু পাল/প্রতিক্ষণ, ১৯৮৯/বারো টাকা

যোগাযোগ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, ৫, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা-৩৭
দূরভাষ : ৫৫-৫০০৭
মুদ্রক : সোম প্রিন্টার্স, ৭, কানাইলাল চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬